জীবন্ত
কংকাল
অগ্নীশ্বর

জীবন্ত কংকাল

অগ্নীশ্বর

সোমা প্রকাশন
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৯

দ্বিতীয় প্রকাশ : শ্রীশ্রীকালীপূজা, ১৩৯৫

মূল্য : দশ টাকা

প্রকাশক : দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়
১৫ বি, অভয় সরকার লেন, কলিকাতা-৭০০০২০
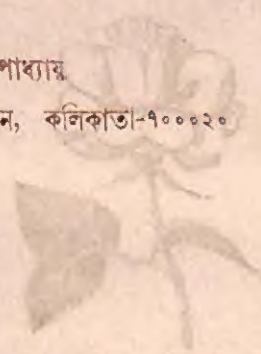
সুনীলকুমার মণ্ডল কর্তৃক ফুলরা প্রিন্টার্স
১১৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

কুয়াশার ছায়া ছায়া অন্ধকার ভেদ করে আশ্চর্য সেই নির্জন প'ড়ো বাড়িটার সামনে এসে লোকটি দাঁড়াল। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চারিদিকটা একবার দেখে নিয়ে মানুষ প্রমাণ ঘাস আর লতাগুল্ম ভেদ করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। কাচ ভাঙ্গা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকাল। সেই মুহূর্তে রহস্যময় বাড়িটার গভীর গহ্বর থেকে অদ্ভুত একটা হিস্‌হিস্‌ শব্দ বাতাসে ভেসে এসে রক্তে হিম ধরিয়ে দিল তার।

সাহসে ভর করে চতুর দৃষ্টিতে পিছনে একবার তাকাল লোকটি। তারপর জীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। কয়েক মিনিট ধরে দেখলো ঘরগুলি। পরক্ষণেই নিচে নেমে এসে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে লাগলো মৃত ঝাউগাছটির দিকে। আবার কানে এলো হিস্‌-হিস্‌ শব্দ আর তখনই দেখলো মাত্র কয়েক হাত দূরে মড়ার মাথার উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা ভয়ংকর বিষধর সাপ ফণা বিস্তার করে হিংস্র-কুটিল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। একটা ইঁট তুলে ছুঁড়ে মারল সে। সঙ্গে সঙ্গে সাপটা ধুপ করে বালিতে লাফিয়ে পড়ল এবং প্রচণ্ড বেগে ছোবল মারল মড়ার মাথার উপর। তারপর অদ্ভুতভাবে

লিকলিকে সরু লেজ দিয়ে মড়ার মাথাটা টেনে নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল। স্থির চোখে এই ভয়ংকর দৃশ্যটা লক্ষ্য করে আপন মনেই হেসে উঠলো লোকটি। মনে মনে ভাবলো, এই সমস্ত দৃশ্যকেই লোকে দুরূহ রহস্যময় করে তোলে এবং ভৌতিককাণ্ড বলে প্রচার করে।

পুরীর এই রহস্যময় বাড়িটা ,যাকে লোকে এতদিন ভূত-কুঠি বলেই জানে সেটাই আজ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। যে ভদ্রলোক বাড়িটি দেখছিলেন তিনি কিম্বা তাঁর কোন বন্ধু খুব সম্ভব কিনবেন। লোকটির নাম বিনায়ক।

বিনায়ক ভূত-কুঠি থেকে বেরিয়ে উদাস দৃষ্টিতে সমুদ্রের তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের মাথায় চায়ের দোকানে এসে বসল। পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরাল। তারপর একমুখ তৃপ্তির ধোঁয়া ছেড়ে বলল, চা দে শম্ভু।

শম্ভু বোস ওর দিকে তাকিয়ে বলল, মেজাজটা আজ তোমার ভাল নেই বলে মনে হচ্ছে?

—তুই-ই তো মেজাজটা খারাপ করে দিয়েছিস। তোর কথাতেই তো ভূত-কুঠি কিনতে এগিয়েছি—

—কিন্তু ওই রহস্যময় ভূতুড়ে বাড়ি কিনে হোটেল করলেও লোকে থাকবে না।

—এ কথাটা আগে মনে ছিল না। দেখ শম্ভু, আমি স্পষ্টকথা বলতে ভালবাসি। তুই যদি ওই বাড়ি না নিস, তা হলে আমাকেই কিনতে হবে।

—সেই ভাল। বলেই চায়ের কাপটা এগিয়ে দেয় শম্ভু বোস। চা-টা শেষ করে বেশ উত্তেজিত ভাবেই উঠে গেল বিনা[illegible]

ভূত-কুঠির কথা ভাবতে ভাবতে পিচরাস্তা ধরে হাঁটছে সে। কিন্তু এত বছর যে ভূত-কুঠির কথা কেউ ভাবেনি আজ ও কেন ভাবছে? কেন ও ভূত-কুঠি কিনতে যাচ্ছে?

এর একটা কারণ আছে। সেটা হ'ল—অনেক বছর পর উড়িষ্যা সরকার সমুদ্রসৈকতের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন। জনসংখ্যার

চাপে শহরে যখন ঠাঁই নেই, তখনই রাজ্য সরকার ঠিক করলেন সী-বীচের কাছাকাছি পতিত বেলাভূমিকে কাজে লাগাতে হবে। তাঁরা ভাবলেন—ওই সমস্ত পতিত বেলাভূমির উপর যদি বাড়ি ঘর রাস্তাঘাট করা যায় তা হলে শহরের জনসংখ্যার চাপ তো কমবেই উপরন্ত সরকারের আয়ও বাড়াবে।

কাজ আরম্ভ হ'ল। দেখতে দেখতে রাস্তাঘাট জল আলো আর নতুন নতুন বাড়ি গড়ে উঠলো। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে গজিয়ে উঠলো বাজার, হাট, হোটেল, রেস্তোরাঁ। কয়েক বছরের মধ্যেই মানুষের ভিড়ে ভ্রমণবিলাসীদের সুখের স্বর্গ হয়ে উঠলো পুরীর স্বর্গদ্বার। লোকে কাঁচা পয়সার মুখ দেখতে পেলো আর তখনই ব্যবসাদারদের মধ্যে সমুদ্রের ধারে বাড়ি জমি কেনার ধূম পড়ে গেল।

শম্ভু বোসও একদিন হাওড়া থেকে ব্যবসা সূত্রে সমুদ্রসৈকতে হোটেল করার জন্যে জমি বাড়ি খুঁজতে লাগল। আর তখনই দেখলো হোটেল করার মত বাড়ি বলতে ওই ভূত-কুঠিই যা আছে। কাজেই ঐ বাড়িটাই নেওয়া মনস্থ করল। কিন্তু বাদসাধল শম্ভুবাবুর স্ত্রী। কাজেই স্ত্রীর কথায় মত পাল্টে যে বন্ধু বাড়ি কিনে দিচ্ছিল তাকে জানালো সব কথা। শম্ভুবাবুর বন্ধু এতে ভীষন অসন্তুষ্ট কারণ ওই বাড়ির পিছনে তার তখন প্রায় হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে।

তা ছাড়া বাড়িটা প্রথমে তুজনের কেনার কথা ছিল। এখন একজন সরে যেতে অন্যজন খুবই অসুবিধায় পড়লো। কিন্তু শম্ভুবাবুর ওই বন্ধুটি [illegible] জেদী একগুঁয়ে। কাজেই কারো সাথে পরামর্শ না করে প্রায় জলের দামে ভূত-কুঠিটা কিনে নিল। তারপর সারাটা-দিন আদালতের চত্বরে কাটিয়ে সন্ধ্যার আগে অবসন্ন দেহে এসে দাঁড়াল স্বর্গদ্বারের মোড়ে।

বাড়িটা কেনার পর থেকেই কিন্তু ওর চোখে মুখে কেমন যেন একটা ভয়ার্ত আতংকের ছায়া দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে মড়ার

মাথার উপর সাপের সেই হিস্‌হিস্‌ শব্দটা এখনও ওর মনের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ওকে দেখতে পেয়ে আরও দুজন কাছে এগিয়ে এলো। এই তিন-জনেরই বয়স ছাব্বিশ সাতাশের মধ্যে। পোষাক পরিচ্ছদ, চালচলন কথাবার্তার ভাব লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায় এরা তিন বন্ধু। ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন কথা হ'ল তিন বন্ধুর মধ্যে। একটু পরেই বিদেশী মদের দোকান থেকে দুটো বোতল হাতে করে শ্মশানের পথ ধরে নির্জন সৈকতে গিয়ে বসল ওরা।

বেলা শেষের শীতার্ত ছায়া ছায়া অন্ধকারে ভিজে বালির উপর ওরা বসে আছে। কেউ কারো মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে কথা বলছে ওরা। হঠাৎ একজন নীরব হ'ল। যে লোকটি নীরব হ'ল সেই বাড়িটা কিনেছে। হয়ত ভাবছে কি করা যায় ওই ভূতুড়ে বাড়িটায়।

সত্যিকথা বলতে কি দুঃসহ নির্জন সৈকতের নিস্তব্ধ ওই প'ড়ো বাড়িটাকে দেখলে যে কোন লোকেরই মনে হবে—ও-বাড়িটা যেন মহা-কালের বুকে নিজেকে বিলীন করে দেবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটা যে একটা ভূতুড়ে বাড়ি তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে যারা ভূত বিশ্বাস করে নি তারাও বলে বাড়িটায় ঢুকলে শ্বাসরোধ হয়ে আসে। একটা হিমেল হাওয়া শিরায় শিরায় শিহরণ জাগিয়ে শরীরের রক্ত জমাট করে দেয়। তারপর চোখের মণি দুটো একসময় আতসবাজির মত শব্দ করে ফেটে যায় এবং পরক্ষণেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

এখন রাত আটটা। সেই সন্ধ্যে থেকে মদ আর ধূমপানের সাথে সাথে ভূতুড়ে বাড়িটার চিন্তায় ওদের মস্তিষ্কের কোষগুলো কেমন যেন ভারি হয়ে উঠেছে।

একজন একটা সিগারেট চাইল। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল কিন্তু কেউ কারো মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলো না।

সিগারেট চাইল বিনায়ক। বিনায়ক মিত্র। এই ভদ্রলোকই বাড়িটা কিনেছে। বিনায়কের গলার স্বর চড়া নয় কিন্তু ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ। মদের ক্রিয়ায় দিনের ক্লান্তি আর উদ্বেগ কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে বিনায়ক। দ্বিতীয়জন কি যেন বলতে যাচ্ছিল তার আগেই বিনায়কের কণ্ঠস্বর জলন্ত বারুদের লিকলিকে শিখা হয়ে ওই ব্যক্তির কণ্ঠস্বরকে মুহূর্তে ঝলসে দিল।

একরাশ তৃপ্তির ধোঁয়া ছাড়ল বিনায়ক। তারপর ঝাঁঝাল স্বরে আবার বলল, তুই আমার সঙ্গে বেশি চালাকি করিস না ভজন। আমি বাড়ি কেনায় তোর যে হিংসে হচ্ছে তা আমি বুঝি।

বিনায়কের কথা শেষ হতেই অন্ধকারের গর্ভ থেকে ভজন গুহর কণ্ঠস্বর প্রতিবাদ করে উঠলো। 'ভারি আশ্চর্য তো! তোর ভালর জন্যেই বাড়িটা কিনতে বারণ করেছিলাম।'

থাক, তোকে আর আমার ভাল দেখতে হবে না। তোর চালবাজীতেই শম্ভু বোস সরে গেছে। ভেবেছিলি আমাকে অপদস্থ করবি। এখন দেখলি তো বিনামিত্তির কারো পরোয়া করে না।

বিনায়কের কথা শুনে ভজন গুহের জোড়া ভ্রূর নিচে নেকড়ের চোখের মত হিংস্রকুটিল মণি দুটো চিক্‌চিক্ করে উঠলো। একটা ক্রোধে চোয়ালের পেশীগুলো ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে গেল। এক নিঃশ্বাসে মদটা শেষ করে দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠলো ভজন। 'মুখ সামলে কথা বলবি বিনা...।' পরমুহূর্তে নিজেকে সংযত করে উঠে দাঁড়াল। বলল, তোকে একটা কথা বলে যাচ্ছি, এই ভূত-কুঠিই তোর জীবনে একটা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াবে।

ভজন গুহ চলে যেতেই তৃতীয় ব্যক্তি মুখ খিস্তি করে উঠলো। এই লোকটি অত্যন্ত চতুর, বুদ্ধিমান এবং ভয়ংকর ধূর্ত। মনস্তত্ব সম্বন্ধের গভীর জ্ঞান। নাম নলিনী সেন।

নলিনী সেন বলল, বুঝলি বিনা, শালা আমাদের জ্ঞান দিয়ে গেল।

—সে আমি বুঝি কিন্তু বাড়িটায় এখন কি করা যায়?

—কেন, হোটেল। হোটেল করবো। আর হাজার দশেক খরচ করলেই বাড়িটা একটা ভাল হোটেল হবে।

—তা হলে কাল থেকে মিস্ত্রি লাগাই, কি বলিস?

তার থেকে ভরত সাহাকে কণ্ট্রাক্ট দিয়ে দিলে খরচ অনেক কম হবে। তা ছাড়া ভরত তো আমাদের বন্ধু, অন্যের থেকে নিশ্চয়ই ও অনেক কমে বাড়িটাকে হোটেলের উপযোগী করে দেবে।

—তা হলে কাল থেকেই যাতে কাজ আরম্ভ হয় তার ব্যবস্থা কর।

—সে কথা আর বলতে হবে না আমি এখান থেকেই ওর বাড়ি যাব। কথা শেষে বোতলখালি করে হন্‌হন্‌ করে চলে গেল নলিন সেন। বিনায়ক সেই শূন্য বোতলগুলি বার কয়েক নেড়ে চেড়ে দেখল; না, এক ফোঁটাও নেই। ওর অন্যমনস্কতার সুযোগে ওরা সবটুকু শেষ করে গেছে। বেশ বিরক্ত ভাবেই ধূসরকাল ঢেউয়ের দিকে তাকাল বিনায়ক। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা অস্পষ্ট খস্‌খস্‌ আওয়াজ কানে এলো। সতর্কতার সাথে উঠে দাঁড়াল। আর তখনই মনে হ'ল একটা হিমশীতল হাত আলতো ভাবে কে যেন ওর ঘাড়ে রাখলো। জামার কলারের পাশে দিয়ে নিজের হাত চালিয়ে ওই হাতটা চেপে ধরবার চেষ্টা করল বিনায়ক। সঙ্গে সঙ্গে একটা অদৃশ্য শক্তি প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ওকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অন্ধকারে সৈকতের ভিজে বালিতে পড়ে গোঁ-গোঁ করতে লাগলো বিনায়ক। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

...

শীতের সকাল। ভূত-কুঠিতে কুলিরা কাজ আরম্ভ করেছে। তাদের অসংলগ্ন কথাবার্তার টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে। খুব সম্ভব ভূত সম্বন্ধেই যে যার অভিজ্ঞতার কথা বলছে। ভজন আর নলিন গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। নলিন ভজনকে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বলল। কথাটা কানে যেতেই রহস্যভরা দৃষ্টিতে উঠোনের সেই মৃত ঝাউগাছটার দিকে তাকাল ভজন। পরক্ষণেই মানুষ প্রমাণ

ঘাস আর লতাগুল্ম ভেদ করে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল গাছটার দিকে। তারপর উবু হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি যেন খুঁজতে লাগলো।

সিঁড়ির কয়েক ধাপ উপরে কনট্রাক্টর ভরত সাহা আর মিস্ত্রি অভয় পদ গাঁজায় টান দিতে দিতে কথা বলছে। তারই ফাঁকে কুলিদের দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। কারণ এই ভূত-কুঠি সম্বন্ধে যে সব কাহিনী ওরা দীর্ঘদিন ধরে শুনে এসেছে তাতে মোহরের গল্প আছে অর্থাৎ এ বাড়িতে নাকি মোহর পোঁতা আছে। অতএব কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ যদি মোহর পাওয়া যায় তা হলে সে মোহর কি ভাবে ভাগ হবে।

কিন্তু বাড়িটা যে কার এবং কি ভাবেই বা ভূত-কুঠি হয়ে উঠলো তার ইতিহাস এরা কেউই জানে না। তা হলে এতদিন যা শুনে এসেছে তা কি মিথ্যে? না, তাও নয়, কিছুটা নিশ্চয় সত্যি। তবে আসল ঘটনাটা অন্য—

ভারতবর্ষ তখন ইংরেজের অধীন। প্রাচীন শহর পুরী আর তার সমুদ্রসৈকতের খ্যাতি তারাই ইউরোপে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে সুযোগ পেলেই অনেক বিদেশী উড়িষ্যার শিল্প-স্থাপত্য, কোণারকের মন্দির এবং সমুদ্রসৈকতের আকর্ষণে ছুটে আসতো। খুব সম্ভব মিঃ জ্যাকসন স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতেই এসেছিল।

সূর্য তখন মাথার উপর। নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে একটা অস্পষ্ট স্বপ্ন যেন দেখল মিসেস জ্যাকসন। মনে হচ্ছে পুরীর সমুদ্র এবং তার চার পাশের সব কিছুই যেন পরিচিত। স্বামীর কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে হাঁটতে কাজুবাদামের গাছের ছায়ায় এসে বসল। তারপর প্রাণচঞ্চল দুটি চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যদি এখানে থাকতে পারতাম।' স্ত্রীর কণ্ঠ স্বরে আকৃষ্ট হল জ্যাকসন। তবু শূন্য দৃষ্টিতে বোঝাবার চেষ্টা করলো, এটা তার মনের কথা কি না? কিন্তু পুনরায় তার স্ত্রী যখন বলল, স্নানের সময় সমুদ্রের মৃদু ঢেউগুলো আঘাত করে কি বলল জান? বলল 'এখানেই তো তোমরা শান্তির নীড় বেঁধে সুন্দর ভাবে জীবন কাটাতে পার।'

স্ত্রীর ভাবাবেগ বুঝতে পারলো মিঃ জ্যাকসন। তবু বলল, 'তুমি বুঝি এখানেই থাকতে চাও?'

হ্যাঁ। শান্ত নির্জন কোলাহলহীন বেলাভূমিতে সত্যি আমি একটা গভীর সুখ অনুভব করছি।

জ্যাকসন সাহেব স্ত্রীকে সুখী করতেই একদিন গড়ে তুলল এই বাংলো। যাকে লোকে আজ ভূত-কুঠি বলে সকলেই জানে।

যে সময়ের কথা বলছি সে সময় সমুদ্রতীরে জনবসতি খুবই কম ছিল। কয়েক ঘর নুলিয়া আর রাজা মহারাজদের কয়েকটা পাকাবাড়ি, তাও আবার ওই সমস্ত বাড়িগুলো বেশির ভাগ সময় খালিই পড়ে থাকতো। তবে মাঝে মাঝে রাজা মহারাজরা দলবল নিয়ে যে ক'দিন হৈ হুল্লোড় আর ফুর্তিতে সময় কাটাতেন সে ক'দিন বেশ প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠতো নির্জন বেলাভূমি। তারপর কিছু বেওয়ারিশ প্রাণের জন্ম দিয়ে নোনা জলে দেহের ময়লা ধুয়ে যখন তারা বাড়ি ফিরে যেত তখন সমুদ্রসৈকতের এ বাড়িগুলোকে প্রেতপুরী বলেই মনে হত। ওই সমস্ত বাড়িগুলোর কিছুটা দূরেই জ্যাকসন সাহেবের কুঠি। বেশ সুখেই ছিল ওরা। ধীর শান্ত ছন্দোময় পদক্ষেপে পিয়ানোর সুরে সুরে কত রাত ওরা নাচল, গাইল। কত বিনিদ্র রজনী পরস্পর পরস্পরের দেহের উগ্রগন্ধ উপভোগ করল। কিন্তু ওদের সন্তানের বয়স যখন চোদ্দ বছর তখনই ঘটল বিপর্যয়। অমাবস্যার আঁধার বুকে নিয়ে ওদের কুঠিতে এসে হাজির হল আর এক ইংরেজ। নাম মাইকেল ফুট। পেশায় মেরিন ইঞ্জিনীয়ার। মিঃ ফুট ছিল মিসেস জ্যাকসনের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ফুটের এই আগমণ মিসেস জ্যাকসনের অতীতের লুপ্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে দিল। কয়েক দিনের মধ্যেই ওরা একে অন্যের কাছে গভীর অনুরাগ ও বিরহের বস্তু হয়ে উঠলো। ওরা যে পরস্পরকে এত ভালবাসতো তা আগে বোঝে নি। এর পর থেকেই মিঃ ফুট অবকাশ পেলেই চলে আসতো জ্যাকসনের কুঠিতে। এক সময় মিসেস জ্যাকসন পিয়ানোয় ঝঙ্কার তুলতে শিখেছিল ফুটের কাছেই। কাজেই জ্যাকসন ঠিক বুঝতে

পারে নি নদীর স্রোত কোন খাতে বইছে। কয়েক মাসের মধ্যেই অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ঘটে গেল। জ্যাকসনের সুখের সংসারে মিঃ ফুট নিজের দেহ নিঙড়োনো মাতাল রস দিয়ে চিরস্থায়ী দাগ কেটে দিল। সে দাগ আর কোনদিন মুছবে না।

কিন্তু বার বার প্রেমাস্পদের কাছে ছুটে আসায় মিসেস জ্যাকসনের যা করা বা বলা উচিত ছিল, তা তিনি করলেন না। ফলে মৃত্যুই হল তার বিধিলিপি।

সেদিন ছিল শ্রাবণের শেষ দিন। জ্যাকসন গেছে শিকারে। ছেলে রবসন তো বেশির ভাগ সময় জেলেপাড়াতেই কাটায়। নুলিয়াদের ছেলেরাই তার বন্ধু। কাজেই একা এত বড় কুঠিতে বেশ নিঃসঙ্গ বোধ করছিল মিসেস জ্যাকসন।

হঠাৎ এসে হাজির হল মিঃ ফুট। ফুটের আগমনে বেশ খুশিই হল মিসেস জ্যাকসন। আঁধার নেমে এল কুঠিতে। বাইরে ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছে। ওরা দুজনে মদ্যপান করতে করতে সরস কথাবার্তা বলাবলি করছে। আস্তে আস্তে এক সময় ওদের বন্ধুত্বটা অত্যন্ত গাঢ় এবং সুখকর হয়ে উঠলো। তারপর এক সময় নিঃশ্বাসের মৃদু শিহরণে মিসেস জ্যাকসনের সূক্ষ্ম শিরা উপশিরায় ঢেউ খেলে যেতে লাগলো। সে ঢেউয়ের আঘাতে ফুটের কাঁধ দুটোও কেঁপে কেঁপে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সজাগ দৃষ্টি প্রসারিত করে আধ ভেজা অবস্থায় ওদের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল জ্যাকসন। কানে এল খিলখিল হাসির আওয়াজ। সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। এমন সময় ফুটের কণ্ঠস্বর বাতাসে কুণ্ডলী পাকিয়ে তীব্রবেগে আঘাত করল জ্যাকসনকে। 'আমি তো আছি।' কথাটা বলতে বলতেই ফুট বুকের নিচে আঁকড়ে ধরলো মিসেস জ্যাকসনকে। সেই মুহূর্তেই জ্যাকসনের বুটের আঘাতে বদ্ধ দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল। মুখে একটা বিশ্রী শব্দ করে ভেতরে ঢুকল জ্যাকসন। তাকে দেখে খাট

থেকে মেঝেতে লাফিয়ে পড়ল মিঃ ফুট। মিসেস জ্যাকসনের সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মত পোষাকটা দেহ থেকে সরিয়ে ফেলেছিল মিঃ ফুট। তাছাড়া বিশেষ একটা অবসাদে এবং আরামদায়ক সুখের একটা অনুভূতিতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসছিল মিসেস জ্যাকসনের। তাই খাট থেকে উঠতে দেরি হয়ে যেতেই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত-ভাবে ঘটনাটা ঘটে গেল। জ্যাকসন ফুটকে লক্ষ্য করেই গুলি ছুঁড়েছিল কিন্তু সে গুলিটা লাগল মিসেস জ্যাকসনের বুকে। এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় আহত পাখির মত কর্কশ আর্ত চিৎকারে মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ে গেল মিসেস জ্যাকসন। প্রাণহীন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো যেন ঘোলাটে হয়ে গেল তার। এই সুযোগেই একটা ক্ষুধার্ত কুকুর যেন তাড়া খেয়ে মুখের রুটি ফেলে আবর্জনার উপর দিয়ে চলে গেল। মিঃ ফুটকে দেখলে তখন তাই মনে হ'ত। চারিদিকে জমাট অন্ধকারে বেলাভূমিতে হেঁটে যেতে লাগল মিঃ ফুট।

একটা নীরব মুহূর্ত।

গুলির শব্দে জ্যাকসনের পিছনে এসে দাঁড়াল এ বাড়ির কেয়ার-টেকার বৃদ্ধ জগন্নাথ দুলিয়া। তাকে দেখে চমকে উঠলেন জ্যাকসন। পরমুহূর্তেই হো হো করে হেসে বলল, আমার সিংহীটিকে দেখ···দেখ কেমন ঘুমোচ্ছে!

মালিকের কথায় ভীষণ বিরক্ত হল জগন্নাথ। তবু তাচ্ছিল্য ভাবেই বলে ফেলল, বাঃ, চমৎকার।

চাকরের অপমানজনক কথায় রাগে কান দুটো লাল হয়ে উঠল সাহেবের। অন্য সময় হলে ওকেই গুলি করে মারতো। কিন্তু এখন ও নিজেই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে চাইছে। ভাবল ছেলেটা এসে যেতে পারে। অদ্ভুত ছেলে ওই রবসন। ভদ্রসমাজের আচার আচরণ ওর ধাতে নেই। বাপের থেকে মাকেই বেশি ভালবাসতো। কাজেই এ অবস্থায় মাকে দেখলে বিক্ষত হৃদয়ে চিৎকার করবে। তাতে ঘটনাটা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে।

শান্ত চোখে জগুর দিকে তাকাল জ্যাকসন। বলল, লাশ এখুনি

সরিয়ে ফেলতে হবে। আমাকে এ অবস্থায় রেখে পালাবার চেষ্টা কর না। অবশ্য এর বিনিময়ে তোমার এবং তোমার মেয়ে পাখির সারা জীবনের ভরণপোষেণের ব্যবস্থা করে দেব।

ওঃ, কি ঘৃণ্য জঘণ্য মানুষ তুমি সাহেব! কথাটা বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো জগু।

জ্যাকসন আবার বলল, কাজ শেষ হলে বাইরে রটিয়ে দেবে মেমসাহেব বিলেতে চলে গেছে। জগুর নীরবতায় জ্যাকসন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

কি? তুমি কি পিছিয়ে যেতে চাও? তা হলে আমার শেষ কথা শুনে রাখ, 'তোমাকে আর তোমার মেয়েকেও আমার হাতে মরতে হবে।

আর কোন কথা বলতে পারলো না জগু। চরম হতাশা আর দুঃখের মাঝেই মালিকের সামনে মেমসাহেবের মৃতদেহটায় হাত দিল। রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহটার দিকে অস্পষ্ট আলোয় একবার তাকালো জগু। তারপর মালিকের সাথে ধরাধরি করে গুলিবিদ্ধ লাশটাকে নিয়ে গেল বাড়ির পিছনে। এবং খুব সহজ ভাবেই তালগোল পাকিয়ে পরিত্যক্ত কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে বালি চাপা দিতে লাগল।

কাজ শেষ হতেই জগু চলে যাচ্ছিল। ব্যঙ্গের সুরে কথাটা বললে জ্যাকসন, 'আরো কিছু কাজ বাকি আছে। সমস্ত ঘর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার কর। খাটে বা বিছানায় কোথাও যেন রক্তের দাগ না থাকে।'

—আমার মেয়ে পাখিকে ডেকে নিয়ে আসি।

—বাজে কথা রাখ—মতলবটা কি? আবার/ একজনকে সাক্ষী করতে চাও?

আর কোন কথা বলতে পারল না নিঃশব্দে চলে গেল জগু। তখনও ওর অতল হৃদয় থেকে চাপা কান্নাটা গুমরে গুমরে উঠছিল। জগু রক্তের দাগ গুলো মুছে ফেলছিল। হঠাৎ কানে এলো জ্যাকসনের শিষ দিয়ে গাওয়া গানের কলি। জ্যাকসনকে আসতে দেখে থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল জগু।
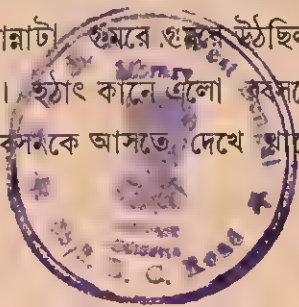
নিজের ঘরে ঢুকল রবসন। তারপর মায়ের ঘরে ঢুকল। রক্ত মাখা ভিজে ভিজে ঘরটা দেখে থমকে দাঁড়াল সে। তারপর আপন মনেই কতকগুলো অর্থহীন শব্দ আওড়ে গেল। বুঝতে পারল কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। মার উজ্জ্বল মুখটা মনে পড়ে গেল এবং মার প্রতি তার যে টান তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে উত্তেজিত হয়ে উঠছে রবসনের দেহ। হিংস্র চাউনিতে চোখ দুটো আগুনের মত দেখাচ্ছে। কানে এল চাপা কান্নার শব্দ। মনে হল বাড়ির পিছনে কে যেন কাঁদছে। শব্দটা অনুসরণ করে ছুটে নেমে এল। আর তখনই দেখলো ওর বাবা কুয়োটার পাশে দাঁড়িয়ে রক্তাক্ত হাতে নিজের মুখ ঢেকে গুমরে গুমরে কাঁদছে। ছেলেকে দেখে একটু সংযত হল জ্যাকসন। তারপর সমগ্র দৃষ্টিটা ছেলের উপর নিবদ্ধ করল কিন্তু এক পাও নড়তে পারল না। কেন যে এমন হল তা সে নিজেও বুঝে উঠতে পারল না।

রবসন চিৎকার করে বলল, 'মা কোথায়?' রবসনের কথাটা জ্যাকসনকে প্রচণ্ড আঘাত হানল। জন্তুদের উপর মানুষ যে ব্যবহার করে ঠিক সেই রকমই হল তার। ছেলের স্পর্ধা আর কৈফিয়তের ভঙ্গি দেখে পৈশাচিক উন্মত্ততার সাথে জ্যাকসন বলল, আমি তাকে খুন করেছি।

কথাটা শোনা মাত্র শঙ্খচূড় সাপের মত বাবার উপর লাফিয়ে পড়ল রবসন। সমস্ত শক্তি দিয়ে দু'হাতে পেঁচিয়ে ধরল তাঁর গলাটা। তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে শ্বাসনালীটা ছিঁড়ে ফেলতে চাইল। আচমকা আক্রমনে জ্যাকসনের দেহটা কুঁয়োর দিকে কাৎ হয়ে যেতেই সেই সুযোগই ধাক্কা দিয়ে রবসন তাকে ফেলে দিল। একটা করুণ চিৎকারে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল জ্যাকসন। স্বপ্নের কবরে চিরদিনের মত স্ত্রীর কাছে ঘুমিয়ে থাকল সে।

এই অশুভ ভয়ংকর মুহূর্তের সাক্ষী থাকল এ বাড়ির কেয়ার-টেকার জগন্নাথ নুলিয়া। জগু এ সমস্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চায় না।

তাই নিঃশব্দে নির্বিকার ভাবে আড়াল থেকে এখনও দেখছে রবসনের আগুনের দীপ্তি ছড়ানো দৃষ্টিটা।

কনুই এ ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রবসন আপন মনেই বলল, শয়তান! মাকে খুন করে পার পাবে ভেবেছিলে। ঘরে এসে ঢুকল রবসন। তারপর জানলা দরজা বন্ধ করে বোবাকান্না বুকে নিয়ে পথে এসে দাঁড়াল সে। অন্ধকারে জনাকয়েক মাতাল কুৎসিত কথাবার্তা বলতে বলতে ওর পাশ দিয়ে চলে গেল।

স্তূপীকৃত অন্ধকারের মাঝেই নুলিয়া পাড়ার দিকে এগিয়ে গেল রবসন। জগু নুলিয়া কিন্তু ইচ্ছায় হ'ক বা অনিচ্ছায় হ'ক, রবসনকে অনুসরণ করে চলেছে। আসলে ওর গতি বিধি লক্ষ্য করাই উদ্দেশ্য।

এক সময় রবসন গিয়ে দাঁড়াল জগুর কুঁড়ের কাছে। ওর মেয়ে পাখিকে ডাকল। একটু পরেই ওর বয়সী একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। ডিবির ক্ষীণ আলোয় রবসনের দিকে তাকাতেই তার মনে হল রবের দৃষ্টি যেন রহস্যের ধোঁয়াটে রেখার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। রবের অদ্ভুত চাউনি দেখে পাখি সত্যি ভয় পেয়ে গেল।

পাখির দিকে তাকালো রবসন। আবেগের সুরেই বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি, চাবিটা রেখে দে পাখি। ফিরে এলে চাবিটা দিস। না ফিরলে ও বাড়ি তোর।'

—তোমার মা-বাবা কোথায়? বাঁকা বাঁকা আধফোটা গোলাপের কুঁড়ির মত চোখে তাকালো পাখি।

ওর চোখের ভাসায় দুঃখের বেদনার ভাবটাই প্রকাশ পেলো। তিলে তিলে সঞ্চিত ভালবাসাটাই যেন ওকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে।

পাখির মনের অবস্থাটা উপলব্ধি করল রবসন। কিন্তু কিছু করার ছিল না। তবু বলল, মা-বাবা চলে গেছে।

—তাই তুমি চলে যাচ্ছ। কথাটা বলেই আরো কাছে এসে ডিবির আলোয় রবসনের দিকে তাকাতেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল পাখির।

রবসন ওকে কাছে টেনে নিল। বলল, কাঁদিস না, আমি আবার আসব। তোর বাবাকে আগের মতই বাড়িটা দেখতে বলিস।

—তবে যে তুমি বলে ছিলে আমাকে ছেড়ে যাবে না। কাঁপা কাঁপা গলায় কথাটা বলল পাখি। রবসন কোন উত্তর দিতে পারল না। অমানুষিক যন্ত্রণা বুকে নিয়ে দ্রুত চলে গেল সে। ওর দেহের বাতাসে পাখির তেল বিহীন রুক্ষ চুলগুলো বারকয়েক কেঁপে ওঠল।

রবসন চলে যেতেই পাখির মনে হ'ল অসীম অনন্ত সমুদ্রের মাঝে ঝড়ের রাতে ওকে একা রেখে রবসন যেন পালাল। মুহূর্ত নিস্তব্ধ অন্ধকারে একটা চাপা কান্না ওর সমস্ত সত্বাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলল।

জগু এসে মেয়ের কাছে দাঁড়াতেই ঢুকরে কেঁদে বাপের বুকে আছড়ে পড়ল পাখি। বলল, 'রব চলে গেছে, ও আর আসবে নাবাবা।'

জগু নিজের মনকে যতটা সম্ভব শক্ত করে সান্ত্বনার সুরে বলল, ও আবার আসবে, আমি ওকে নিয়ে আসবো। চল, ঘরে চল মা।

মেয়েকে নিয়ে কুঁড়ের ভেতর ঢুকে ঝাপ বন্ধ করে দিল জগু। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের এবং মেয়ের সুখ শান্তির কথাটা বেশি করে মনে হ'ল তার। প্রভু এবং প্রভু পত্নীর মৃত্যুটা যদিও খুবই মর্মান্তিক বেদনাদায়ক তবু তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উপর লোভটাই মনের একটা বিশেষ জায়গায় উঁকি দিচ্ছে। ভাবল অবস্থাটা হয়ত ফিরে যাবে। কাজেই রবসনকে খুঁজে নিয়ে আসাটাই বোধ হয় ভাল। কোথায় আবার যাবে ছেলেটা—বড় জোর সমুদ্রসৈকতে। মেয়েকে রেখে বেরিয়ে গেল জগু।

স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে সাহেবদের নির্দিষ্ট পানশালায় বসে আছে মিঃ ফুট। জ্যাকসনের গুলির হাত থেকে বেঁচে গেলেও ওর মনে হচ্ছে মিসেস জ্যাকসনের মৃত্যুর চেয়ে সত্য বুঝি পৃথিবীতে আর কিছু নেই। অশুভ সন্ধ্যা জীবনকে বিবর্ণ করে দিয়েছে। এখন কি করা যায়, পুলিশে খবর দিলে তো নিজেও জড়িয়ে পড়বে। প্রতিশোধ নিতে গেলেও

অপেক্ষা করতে হবে, কাজেই কাজের জায়গায় ফিরে যাওয়াই ভাল। মিঃ ফুট পথে নামল। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তার কারণ জ্যাকসনকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় হাঁটুতে আঘাত পেয়ে ছিল। জুতো জোড়া খুলে ব্যাগে রাখতে গিয়েই রবসনের উপর নজর পড়ল। ওকে দেখে খুবই বিস্মিত হল ফুট। গ্যাস বাতির আলোয় ফুটকে দেখে রবসনও কেঁদে ফেলল। যে পরিস্থিতির মধ্যে ফুট আর রবসনের সাক্ষাৎ ঘটল তাতে ফুটের মনে অনাবশ্যক ভয় দেখা দিল। কিন্তু সামান্য কথায় মা বাবার বিপর্যয় পরিণতির কথা যখন রবসন বলল, তখন ফুটের মন খুশিতে ভরে উঠলো। নিজে যা পারে নি, রবসন তা পেরেছে এ যেন তারই জয়।

রবসন তুমি খুনী! তোমার রক্তমাখা হাত জীবনের চাকাটাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিলে এখন কি করবে? কথাটা বলেই তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল মিঃ ফুট।

—সমুদ্রেই আমি ডুবে যেতে চাই। আমি মরব আংকেল, আমি বাঁচতে চাই না।

—'বোকা, একেবারে বোকা তুমি রবসন।' আমি যখন আছি তখন তোমার ভয় কি, চল আমার সঙ্গে। সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে সারা পৃথিবীটা তোমাকে দেখিয়ে আনব।

নীরবে কি যেন ভাবতে লাগলো রবসন। মিঃ ফুট আবার বলল, নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে নেই, কি মন স্থির করলে বল?

'আমি যাবো' আংকেল কথাটা বলেই ফুটের দিকে তাকালো রবসন।

জগু নৌকার আড়াল থেকে কথাগুলো শুনলো। এবং বুঝলো আজ থেকে বরসন ফুটের শিকারে পরিণত হল।

ওরা চলে যেতেই বিষণ্ণ মনে পাখির কাছে ফিরে এল জগু। আর তখনই মনে হল সাহেবের সম্পত্তির থেকে ওর ছেলেকেই বোধ হয় বেশি ভালবাসে।

সাহেবের কুঠিতে কাজ করতে করতে মাছ ধরাটা ছেড়ে দিয়েছিল জগন্নাথ। কাজেই জাল নৌকার সাথে অনেক দিন কোন সম্বন্ধ ছিল না। এ অবস্থায় আবার গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু দিন চলবে কি করে? ভাবতে ভাবতে আয়ের যখন পথ খুঁজে পাচ্ছে না তখন পাখিই বলল, বাবা আমি রাজমিস্ত্রির সাথে কাজ করতে যাব?

—না। আমি যতদিন আছি, তোকে কোথাও যেতে দোব না।

—কিন্তু এভাবে তো আর বাঁচা যায় না?

—আমি কাল থেকে কাঁকড়া ধরতে যাব।

বাবার কথা শুনে মনে মনে দুঃখ হচ্ছিল পাখির। তবু বলল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব বাবা।

মেয়ের কথা শুনে শিরদাঁড়ায় যেন একটা শিহরণ খেলে গেল জগুর। মেয়েটা বলে কি! গভীর রাতে কাঁকড়া ধরতে যাবে? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল মেয়েটাকে একা ঘরে রেখে রাতে বেরিয়ে যাওয়া অপেক্ষা তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই বোধ হয় ভাল। জগু রাজি হল। সে রাত থেকেই কাঁকড়ার সন্ধানে বেরুল ওরা।

বিক্ষিপ্ত ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মাঝে গভীর রাতে সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়াল বাপ আর মেয়ে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখল জল ভরা মেঘ ঘনিয়ে আসছে। তারই মাঝে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ভিজে বালিতে লাফিয়ে লাফিয়ে পাখি কাঁকড়া ধরছে। জগুও ক্ষিপ্রতার সাথে বেশ কিছু কাঁকড়া ধরল।

কয়েক ঘন্টার মধ্যে জালটা প্রায় ভরে গেল। আয়ের একটা পথ খুলে গেল ওদের কাছে।

এ ভাবেই কাটতে লাগলো দিনগুলো। কাঁকড়া বিক্রি করে যা পায় তাতে বাপ মেয়ের ভালভাবেই চলে যায়।

রোজের মত কাঁকড়া ধরতে বেরুল জগু। পাখি আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝল দেরি হয়ে গেছে। আকাশ ফর্সা হলে কাঁকড়াগুলো জলে নেমে যায়, তাতে শূন্য হাতে ফিরতে হয় কাজেই প্রাণপনে

লোহার শিক দিয়ে গর্তগুলো খুঁড়ে কাঁকড়া ধরতে লাগল। ওর ভাগ্য ভাল ছিল জাল ভর্তি হয়ে গেল।

প্রায় বছর খানেক ধরে জগু কাঁকড়ার জাল কাঁধে নিয়ে বাজারে যাবার সময় সাহেব-কুঠির পাশ দিয়ে যেতো। দেখে যেতো কুঠিটা ঠিক আছে কিনা। আজও গিয়ে দাঁড়াল কুঠির সামনে। ভাবল চাবিটা যখন সঙ্গেই আছে তখন ঘরগুলো একবার খুলে দেখে যাই। দরজা জানলায় উঁই ধরে থাকতে পারে। গেটের সামনে কাঁকড়া ভর্তি জালটা নামিয়ে একটা 'পিকা' ধরালো জগু। তারপর তালাটা খুলতে লাগল কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও যখন তালা খোলা গেল না, তখন একটা পাথর নিয়ে তালায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল আর ঠিক সেই মুহূর্তেই হাতটা অবশ হয়ে যেতে লাগল। মনে হ'ল এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস কুয়াশা ঘেরা বাড়িটা থেকে ছুটে এসে শরীরে যেন কাঁপন ধরিয়ে দিল। একটা ছায়া-ছায়া কম্পমান কালো হাত শূন্যে ভাসতে ভাসতে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। অশরীরী রহস্যময় কিছু যেন ওকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে। গা ছম ছম করে উঠল জগুর। ভয়ে আর্ত চিৎকারে কাঁকড়া ভর্তি জাল ফেলেই প্রাণপণে ছুটতে লাগল। বাড়িতে গিয়েও ভয়টা কমল না। কেবলই মনে হতে লাগল অশরীরী ছায়ার মত কি যেন একটা ওরই কাছাকাছি ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিবেশীদের বলল ঘটনাটা কিন্তু কেউ বিশ্বাস করল না।

এর কিছুদিন পর পাখি গেল কুঠিতে। বহুদিন ঘরগুলো পরিষ্কার হয় নি তাই বাপ মেয়েতে তালা ভেঙে ঘর দোর পরিষ্কার করতে লাগল। কিন্তু নিরানন্দ হতভাগা ঘরটায় কয়েক ঘণ্টা কাজ করার পরই পাখি অসুস্থ হয়ে পড়ল। আর সবচেয়ে আশ্চর্য এবং বিস্ময়কর ঘটনা যা ঘটল, তা হল সেদিনেই আকস্মিক ভাবে পাখির মৃত্যু।

জগু বলল মাত্র একমুহূর্ত পাখিকে একা রেখে পাশের ঘরে গেছলাম এসে দেখি নেই। নাম ধরে ডাকলাম সাড়া পেলাম না। কে যেন বলল, পাখি সমুদ্রে ডুবে গেছে। ছুটে গেলাম সমুদ্রের দিকে। কিছু

লোক পাখির মৃতদেহ ঘিরে নানা ধরনের কথা বলছে। সমুদ্র তীরে পাখির প্রাণহীন দেহ দেখে পাগলের মত হয়ে গেলাম। ওকে কোলে তুলে নিতেই আস্তে আস্তে চোখের পাতা খুলে গেল। কিন্তু একটা কথাও বলল না। আজও বুঝতে পারি নি এত অল্প সময়ের মধ্যে পাখি কিভাবে মারা গেল? তবে কি ওর মন কোন অশরীরী কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল? যার ইচ্ছাশক্তিই ওকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য করল। স্থানীয় লোকেদের মনে এ ঘটনার পর বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেল বাড়িটা ভূতুড়ে। এর পর থেকে বাড়িটায় কেউ যেত না। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই মানুষ প্রমাণ ঘাস আর জংলা গাছে ভরে গিয়ে আরো রহস্যময় হয়ে উঠল বাড়িটা।

জীবনের প্রতি জগুর আকর্ষণ বোধ হয় খুবই বেশি। এই ক'বছরের মধ্যে তার নাড়ীর স্পন্দন অতি ক্ষীণ হয়ে গেছে। পৃথিবীর সব কিছু দৃশ্য বস্তু চোখের আলোয় ভাল দেখতে পায় না। তবু সে কাঁকড়া ধরতে বেরিয়ে পড়ে।

বর্ষা রাতের শেষ আঁধারে রোজের মত সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়াল জগু। দেখল একটা মাছ ধরা নৌকা তীরে এসে লাগল। একটু বিস্মিত হ'ল। অন্ধকারেই তার স্মৃতিতে জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠল রবসনের ভাসা ভাসা মুখের ছবি; মনে কৌতুহল জাগল, লোকটা কে? নৌকা থেকে নেমে নিশ্চল স্থির হয়ে দাঁড়াল লোকটি। কিছুক্ষণ ধরে চারদিক তাকিয়ে দেখল। তারপর একটা বস্তা কাঁধে করে বেলাভূমির উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। বস্তাটার ভারে মাথাটা বুকের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল তার। তবু অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে সাহেব-কুঠির দিকে হাঁটছে। লোকটির পিছু পিছু এগিয়ে গেল জগু। দেখল কুঠির উঠোনের সেই

মৃত ঝাউ গাছটার কাছে বস্তাটা নামাল। একটু পরেই হাঁটু গেড়ে পাথর সরিয়ে বস্তাটা সুড়ঙ্গে রেখে চলে গেল। তারপর সরু ছিদ্রপথ দিয়ে সাপ যেমন এঁকে বেঁকে দেওয়ালের ফাটলে ঢোকে ঠিক তেমনি ভাবে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল লোকটি।

চক্‌মকির আলোয় দেখল ঘরের জানলা দরজা ভেঙে পড়ে আছে। একটা ঘরে ঢুকে নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। চোখ দুটো ভারি হয়ে উঠল তার।

লোকটির ভাবগতিক দেখে জগুর সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। নিশ্চয়ই এ ছোটসাহেব রবসন। লতা গুল্ম ভেদ করে যখন জগু ওকে অনুসরণ করছিল তখনই খস্‌খস্ শব্দে সজাগ দৃষ্টিতে লোকটি তাকিয়ে ছিল কিন্তু ওকে দেখতে পায় নি। ভেবে ছিল শৃগাল অথবা অন্য কোন প্রাণীর পায়ের শব্দ।

লোকটি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। সে শব্দে চামচিকেগুলো ডানা ঝাপটা দিয়ে ঘরময় উড়ে বেড়াতে লাগল। বিশ্রী একটা গন্ধে গা বমি বমি করে উঠল তার। লোকটি উঠে দাঁড়াতেই মুখোমুখি হল জগু। মাথায় জড়ান কাপড়টা পিছনে সরে গেল আর তখনই জগু ভারি গলায় বলে উঠল, ছোট সাহেব!

মুহূর্তে মনের মধ্যে যেন ঝড় উঠল লোকটির। নিষ্প্রভ স্থির দৃষ্টিতে তাকাল জগুর দিকে। জগু গমগমে গলায় আবার বলল, আমি 'জগু' ছোটসাহেব। পুরু মোটা ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল রবসনের। চোখের কোণে বেদনার অশ্রু। নির্বাক নিস্তব্ধ মুহূর্ত। অনেকক্ষণ পর রবসন কথা বলল, 'পাখি কেমন আছে?' রবসনের মুখে মেয়ের নামটা শুনে ককিয়ে কেঁদে উঠল জগু। জগুর কান্নায় স্থির থাকতে পারল না রবসন। অস্থির হয়ে বলল, 'পাখি, আমার পাখি নেই!' হা ভগবান···

একদিন যে সহজ সরল ছিপছিপে মেয়েটি ডুরে শাড়ির নিচে ছোট ছোট পায়ের উপর রুপোর নুপুর বাজিয়ে সমুদ্রের বেলাভূমিতে

ছুটে বেড়াতো, সে আজ নেই! পাখির মন মাতান সতেজ প্রাণের স্পন্দন আর ও পাবে না। তাই বোধ হয় অতীতের কথাগুলো মনের মাঝে ভীড় করে আসছে রবসনের।

—কি হয়েছিল পাখির? আমি যে ঘর বাঁধার স্বপ্নে বিভোর হয়ে মৃত্যুর বুকে পা রেখে এগিয়ে এলাম।

সমুদ্র ওকে নিয়ে গেছে ছোটসাহেব। কথা বলেই বুকে একটা যন্ত্রণার অস্তিত্ব অনুভব করল জগু। মনে হল ভেতরটা তার শূন্য হয়ে গেছে। তবু বলল, কিন্তু তুমি এভাবে কোথা থেকে এলে? এতদিন ছিলেই বা কোথায়?

আংকেল ফুটই আমাকে নিয়ে গেছল। তারই সাহায্যে জাহাজে কাজ পেলাম। সারাটা পৃথিবী ঘুরলাম। কিন্তু মন পড়ে থাকল সব সময় পুরী শহরের উপর। হয়ত পাখির ভালবাসাটাই আমাকে এখানে আসার জন্য অস্থির করে তুলেছিল।

বহুদিন পর নক্ষত্রহীন আকাশের নিচে উত্তাল সমুদ্রে আমাদের জাহাজ ভিড়ল। আংকেল ফুট ঘুমোচ্ছে। আর অদ্ভুতভাবে আমার মাথায় শয়তানী বুদ্ধিটা চাড়া দিয়ে উঠল। বহু প্রতীক্ষিত সুযোগ এসে গেল আমার হাতে।

নিঃশব্দে স্ট্রং রুমে ঢুকলাম। সিন্দুকের ঢাকনা খুলে মোহর ভর্তি করলাম বস্তার মধ্যে। তারপর নামিয়ে দিলাম জেলের ডিঙ্গির ওপর। দড়ি বেয়ে লাফিয়ে পড়লাম। ডিঙ্গির জেলেটার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে উঠে দাঁড়াবার আগেই ধাক্কা দিয়ে তাকে সমুদ্রে ফেলে দিলাম। পর মূহূর্তে অন্ধকার ভেদ করে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের সাথে লড়াই করে তীরের দিকে এগিয়ে এলাম। তারপর···

তারপর আমি জানি ছোটসাহেব। কথাটা বলেই ক্ষীণ দৃষ্টিতে রবসনের মুখের দিকে তাকাল জগু।

আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে আমাকে একটু জল দিতে পার? আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না, হয়ত প্রয়োজনও নেই।

কথা শেষ হবার আগেই জগু জলের জন্য নিচে নেমে গেছে।
রবসন টলতে টলতে ওর মায়ের ঘরটায় ঢুকল। কি আশ্চর্য, দেখল টেবিলের উপর চীনা মাটির পাত্রে রুটি আর একগ্লাস জল ঢাকা দেওয়া আছে। ভাবল এগুলো বোধ হয় জগুর রাতের আহার। কিন্তু ক্ষুধার্ত রবসন রুটি দেখে স্থির থাকতে পারল না। প্লেটটা তুলে।রুটিতে হাত দিতেই আর তক্ষুণি কে যেন ছোঁ মেরে হাত থেকে প্লেটটা কেড়ে নিল। জলের গ্লাসটাও নেই টেবিলের ওপর।

এক মুহূর্তের জন্য ভয়ে যেন নাড়ীর স্পন্দন থেমে গেল। নিজের ছায়া দেখেই বোধ হয় শিউরে উঠল সে। দরজার পাশে পিঠ রেখে দাঁড়াল। একটা দমকা কাশিতে মুখ দিয়ে খানিকটা রক্ত যেন বেরিয়ে পড়ল। হাত পা তার অবশ হয়ে যাচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল রবসন। কিন্তু পা তুলতে গিয়েই মনে হল সরু সুতোর ফাঁসে পা দুটো বাঁধা। অন্ধকারেই ফাঁসটা খুলবার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই খুলতে পারল না। আর তখনই বুঝল বাইরে থেকে কে যেন তাকে টানছে। আমায় তা হলে কি মোহরের লোভে জগুই আমাকে মেরে ফেলতে চায়! এটা যে ওদের জাল বোনার সরু নাইলন সুতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ফাঁসটা দিল কখন? নিশ্চয় আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে ও পায়ে ফাঁস লাগিয়ে দিয়েছে।

প্রচণ্ড একটা ঘৃণায় চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল রবসনের। জেদ চেপে গেল। দেখবে এ সুতোর শেষ কোথায়! সুতোটা ধরে উন্মাদের মত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল; আর তখনই মনে হল কাঁটা জঙ্গলের উপর দিয়ে সুতোটা যেন বাড়ির পিছন দিকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

রবসন মানুষ প্রমাণ ঘাস আর জংলা গাছের মধ্যে দিয়েই আহত পশুর মত ছুটে যেতে লাগল। ও যতই এগিয়ে যাচ্ছে সুতোটাও ওর আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে যাচ্ছে। সেই অভিশপ্ত কুয়োটার কাছে এসে বুঝতে পারল, কুয়োর ভেতর থেকেই কে যেন ওকে টেনে নামাতে চাইছে। রবসন আরএকবার প্রাণপণে সুতোর বেড়াজাল থেকে
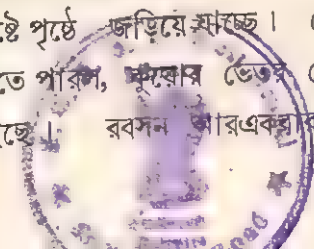
মুক্ত হতে চাইল। কিন্তু সুতোটা তখন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে, শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। অকস্মাৎ দেহটা কুয়োর দিকে ঝুঁকে গেল তার।

জগু জল নিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ শুনতে পেয়ে কুয়োর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ছোটসাহেব, ওদিকে যেও না।'

রবসন জগুর কথা শুনতে পেলেও বুঝতে পারল না। কারণ একটা অদৃশ্য শক্তি তখন ওর সমস্ত সত্তা কেড়ে নিয়ে ওকে কুয়োর মধ্যে টেনে নিচ্ছে। শুধু একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে এল, 'বড় অন্ধকার। আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ···বাবা আমাকে কোথায়···।'

দৃশ্যটা দেখে জগু স্তব্ধ হয়ে গেছল। কিন্তু পর মুহূর্তে পশুর কংকালের মত মৃত ঝাউগাছটার কাছে সুড়ঙ্গের পাথর সরিয়ে মোহরের বস্তা দেখে হো হো করে হাসতে লাগল। সে হাসিতে সারা বাড়িটা যেন ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল। জগু মোহরের বস্তাটা নেবার জন্য যখন হাত বাড়াল তখনই সে রবসনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সে স্বর যেন কোন স্বপ্নময় জগৎ থেকে কাতর ভাবে বলছে, 'ও মোহর নিও না। জগু নিও না।'···কথাটা শুনেই মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল জগুর। সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড জ্বালা অনুভব করতে লাগল।

তারপর মুমূর্ষু অবস্থায় যখন কুঁড়েতে সে ফিরল তখন সে একটা বদ্ধ উন্মাদ। মোহরের কথা বলতে বলতেই কয়েক দিনের মধ্যে মারা গেল জগু।

জগুর মৃত্যুর দুঃখের অংশীদার হল পাড়ার অনেকেই। কিন্তু তারা এও বলল, 'জগু নিশ্চয় সাহেবের মোহর-টোহর চুরি করতে গিয়ে-ভূত দেখেছে। ভূতই ওকে মেরেছে। সাহেব কুঠিতে কাজ করতে গিয়ে পাখি মরল, জগু মরল, কাজেই ওটা ভূত-কুঠি।

এই হল ভূত-কুঠির ইতিহাস। আজ সেই কুঠিতেই কণ্ট্রাক্টর ভরত সাহা কুলি লাগিয়েছে। ভজন মোহরের সন্ধান করছে কারণ

নলিন যে ভাবে ওকে বলেছে, তাতে মোহরের সন্ধান ও করতে পারবে। তাছাড়া কুলিদের দিকেও নজর রাখা দরকার। বলা তো যায় না কার ভাগ্যে কি আছে।

বিনা মিত্তির!

হ্যাঁ? সেই বিনামিত্তির। যে গত রাতে সাগর বেলায় শ্মশান সীমান্তে সারা রাত পড়েছিল। বাড়ি কেনার পরেই শ্বাসরোধকারীর যে ঘটনা ঘটেছে তাতে ওকে রক্তহীন বলে মনে হচ্ছে। ভোরে জ্ঞান ফিরতেই নিজের অবস্থার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল তার। কাঠগোলার মালিক কাশীবেহারা এসে না পড়লে কি হত বলা যায় না। কাশীই বিনায়ককে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল।

এখন বেলা ন'টা। ক্লান্ত অবসন্ন বিনায়ক ঘুমোচ্ছে। ওর শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল নলিন। দেখল খাটের কিনারা দিকে কাত হয়ে শুয়ে আছে বিনায়ক। তার মুখটা ঘামে ভিজে গেছে। নলিন ডাকতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখে তাকাল বিনায়ক। প্রথমটা কথাই বলতে পারল না সে। কারণ রাতের ঘটনা, স্নায়ুর উপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে এখনও দুর্বলতা কাটে নি। অনেক পরে বিষন্ন কণ্ঠে বিনায়ক বলল, নলিন আমার মুখটা বিশ্রী তেতো লাগছে। দেখ তো, জ্বর হয়েছে কিনা—

বিনায়কের গায়ে হাত দিয়ে নলিন বলল, 'জ্বর ও কিছু নয়।' কিন্তু এক রাতেই একি চেহারা হয়েছে তোর। কথাটা বলেই অদ্ভুত ভাবে তাকাল নলিন। বিনায়ককে দেখে তার মনে হ'ল অন্ধকার গলি পথে গ্যাস বাতির উপর নারকেল গাছের ছায়া পড়লে যেমন দেখায় ওকে এখন ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। ও যেন জীবনের সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত-অদ্ভুত একটি জীব।

বিনায়ক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে নলিনের দিকে। একটা আলো আঁধারের খেলা চলছে মনে। মনের সুরটা অনেক—

অনেক দূরে সমুদ্রের শ্মশানটা ছুঁয়ে আবার মনের মাঝেই ফিরে আসছে।

বিনায়কের হাবভাব দেখে এতক্ষণে নলিন বুঝতে পারল কোন এক দুঃস্বপ্ন যেন ওর সত্বাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তবু বলল, 'আর কত ঘুমোবি, ওঠ।'

—আমার কিছু ভাল লাগছে না রে।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাক গে, একবার আসবি। কুঠিতে কাজ আরম্ভ হয়েছে। 'আমি চলি।' কথাটা বলেই ভুত-কুঠির দিকে চলে গেল নলিন।

কুঠিতে ঢুকেই নলিন দেখল ভজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মোহর খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ ভজনের চোখ দুটো অদ্ভুত ভাবে চক্‌চক্‌ করে উঠল। সত্যি ও একটা মোহর দেখতে পেয়েছে। আনন্দে চিৎকার করে মোহরটা হাতে নিতেই অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ভজনের। ঠিক যেন মৃত্যুর স্তব্ধ মুহূর্তের মতই সেই অনুভূতি। এক দৃষ্টে মোহরের দিকে তাকিয়ে আছে ভজন। কিন্তু মোহরের মধ্য থেকে একটা বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে আতংকিত হয়ে উঠল। ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মোহরের ভেতর থেকে দুটো হিংস্র কুটিল আগুন-ঝরা চোখ প্রতিহিংসার দৃষ্টিতে যেন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ভয়ে চিৎকার করে উঠল ভজন।

তার চিৎকারে বাস্তব পরিস্থিতিটা লক্ষ্য করে ওর কাছে নলিন ছুটে এল। কর্কশ কণ্ঠে কি যেন বলল এবং ভজনের হাত থেকে মোহরটা কেড়ে নেবার জন্যে থাবা বাড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তেই কোথা থেকে যেন একটা ভয়ংকর বিদঘুটে বীভৎস চেহারার প্রেতের মত মানুষ ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার ইস্পাতের মত শক্ত হাতের চাপে দুজনেই দূরে ছিটকে পড়ল। তারপর চক্ষের পলকে মোহরটা কেড়ে নিয়ে ভৌতিক মানুষটা কাঁটা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। নলিন আর ভজনের ভয়ার্ত চিৎকারে বাড়িটা যেন কেঁপে উঠল। ওদের চিৎকার শুনে ভরত সাহাও অভয়পদ ছুটে এল। এক নিঃশ্বাসে

ভজন নলিন ঘটনাটা বলতেই ওরা কুলিদের দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল সেই ভূতুরে লোকটিকে। কিন্তু কোন লোকের হদিস ওরা পেল না। ভজন নলিন তখনও থর থর করে কাঁপছে। ওদের অবস্থা দেখে ভরত সাহা হাসিল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, 'পুরো ব্যাপারটাই স্রেফ গাঁজা।' দিনের বেলায় ভূত দেখছে। যত সব—

ভরতের ক্লেদাক্ত সুরের কথাটা অসহ্য লাগল ওদের কিন্তু কিছু বলতে পারল না। দুজনেই একটা তিক্ত যন্ত্রণা নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি চলে গেল। কুলিরা চলে গেল দুপুরের আহারে।

ভরত ধীর পদক্ষেপে নিঃশব্দে গিয়ে বিশ্রামের ভঙ্গিতে বারান্দায় শুয়ে পড়ল। মধ্যাহ্নের এ নীরবতা আর ঝাউগাছের শিরশিরে বাতাসে চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল ভরত। হঠাৎ একটা টিকটিকি ধপ করে ভরতের বুকে পড়তেই ধড়ফড় করে উঠে বসল। কালো টিকটিকিটা তখন দেহে কাঁপন তুলে ছুটে কড়িকাঠে উঠে গেছে। রাগে গরগর করতে করতে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারল। কি আশ্চর্য সেই মুহূর্তেই এক ঝলক হিমশীতল বাতাস ভরতকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল আর সেই টিকটিকিটা জ্বলজ্বলে চোখে ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ক্রমে সেটা বড় হতে হতে ভয়ংকর হয়ে উঠল। দৃশ্যটা দেখে ভরতের মুখের রং ফ্যাকাশে হয়ে সমস্ত স্নায়ুগুলোকে নিমেষে নিস্তেজ করে দিল।

ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল ভরত, একটু পরেই পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক হল। মিথ্যা ভয় মনে করে আপন মনে হেসে উঠল ভরত। ভাবল এটা নিছক মনের ভুল। ঘুমের যখন ব্যাঘাতই হল, তখন আর কি করা যায় এক ছিলিম গাঁজা টানা যাক। কিন্তু এ কি! কল্কেটা গেল কোথায়! ভারী আশ্চর্য তো! শোবার আগে মাথার কাছে কল্কেটি রেখেছিল এখন খুঁজতে গিয়ে কোথাও পেল না। ভাবল নিশ্চয়ই নলিন ভজন কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। ভীষণ রাগ হল। ঠিক তখন কোথা থেকে যেন গাঁজার ভুর ভুর গন্ধ মাতাল বাতাসে ভেসে

আসতে লাগল। ও ভাবল নিশ্চয়ই ভজন নলিন ওর গাঁজার শ্রাদ্ধ করছে। বাড়ির পিছন দিকে এগিয়ে গেল আর ঠিক বাঁকটা ঘুরতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। একটা অদ্ভুত ধরনের মানুষ ওর দিকে পিছন ফিরে গাঁজা টানছে। লোকটাকে আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। নিশ্চয় বেটা চোর হবে। ভরত চড়া সুরেই বলল, 'কে হে তুমি ?'

কোন উত্তর নেই। নির্বিকার ভাবে খোস মেজাজে গাঁজা টেনে যাচ্ছে লোকটি। ভরত রেগে গেল। শালা চোর, আমার গাঁজা চুরি করে খাওয়া হচ্ছে। মারবো শালার মাথায় থান ইঁট, বলেই যেই না ইঁট তুলেছ লোকটা হাওয়ার সাথে মিলিয়ে গেল।

চোখের সামনে জলজ্যান্ত মানুষটাকে এভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে ভরতের চোখ বন্ধ হয়ে গেল। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল সে।

বিনায়ক এল কাজ দেখতে। এখন ওকে সুস্থ বলেই মনে হচ্ছে। গত রাতের ঘটনাটায় ওর মনে নানা সংশয় দেখা দিয়েছে। ভাবল যা ঘটেছিল তা হয়ত অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত অথবা ভজন ওকে অন্ধকারে একা পেয়ে ভূতের ভয় দেখাতে চেয়েছিল। এ ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না। এই কথা ভাবতে ভাবতে ভূত-কুঠি ঘুরে ঘুরে দেখছিল বিনায়ক। হঠাৎ নজর পড়ল ভরতের উপর। একি ! ভরত ওভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন ! কাছে গিয়ে ডাকল। 'ভরত, এই ভরত—হারামজাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছিস।' ভরত একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বিনায়ক রেগে যায়। বলে মারবো ব্যাটাকে এক লাথি বলেই এক লাথি মারল। ভরত পড়ে গিয়েই মাগো-বাবাগো—ভূত ভূত বলে বলে চেঁচিয়ে উঠল। হেঁচকা টান মেরে তার হাত ধরে তুলল বিনায়ক। সঙ্গে সঙ্গে ভরত ওকে জড়িয়ে ধরে—ভূ—ভূ—ভূ করতে লাগল।

—কি হয়েছে বলবি তো ?

—ভূত। বিনাবাবু, ভূত আমার গাঁজা খেয়ে নিয়েছে।

বিনায়ক ধমকে উঠল। ভূত কিছু পেল না তোর গাঁজা খেয়ে গেল। যত সব বাজে কথা—

কিন্তু ভরত যখন সমস্ত ঘটনাটা বিস্তারিত ভাবে বলল, তখন বিনায়কের মনটাও কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠল। ভাবল নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। যাক গে, এক কাজ কর তুই বরং মোড়ের মাথায় ঘুরে আয়, আমি বসছি। কথাটা বললেও বিনায়কের মনে কিন্তু ভয় হ'ল কাজেই বসাতো দূরে থাক ভরত যাবার আগেই বেরিয়ে গেল বিনায়ক। যাক, এর মধ্যে কুলিগুলো ফিরে এল। আবার গাছ কাটার শব্দ আর কোলাহলে ভরত মনে সাহস পেল।

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। গাঢ় রক্তবর্ণের সূর্যালোক এসে পড়েছে বাড়িটার ওপর। অবাঞ্ছিত গাছগুলো কেটে ফেলাতেই এটা সম্ভব হয়েছে। পরিত্যক্ত বাড়িটার যেন দ্রুত রূপ পরিবর্তন হচ্ছে। ভরত নিবিষ্ট মনে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। অভয়পদ কাছে এসে দাঁড়াল। এক ছিলিম হবে নাকি কত্তা ? বলেই গাঁজার পোঁটলা বার করল। গাঁজা দেখা মাত্র ভরতের উদাসীন দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, দাঁড়া কল্কেটা নিয়ে আসি।

চলমান ছায়ার মত লম্বা লম্বা পা ফেলে কল্কেটা কুড়িয়ে বার কয়েক ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝাড়ল এবং ফিরে এসেই তার মনে হ'ল যেহেতু এ কল্কে দিয়ে ভূতে গাঁজা খেয়েছে সেহেতু এ কল্কেতে মানুষের খাওয়া চলবে না। অভয়পদও ওর কথায় একমত। কল্কেটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল ভরত। পরক্ষণেই ঘটল অদ্ভুত বিস্ময়কর ঘটনা। একটা পোঁটলা এসে পড়ল ভরতের মাথায় ওপর। ভয়ে এক লাফে সরে গেল ভরত। তার লাফ দেখে অভয়পদও দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খেলো।

ভরত বলল, কি ওটা ! পাতে মোড়া পোঁটলায় কি আছে ? এলই বা কোত্থেকে ? আশ্চর্য হয়ে ঝুঁকে ওরা পোঁটলা দেখতে লাগল দুজনে।

ওদের ভাবভঙ্গি দেখে কর্মরত কুলিগুলোও কাজ ফেলে এসে দাঁড়াল এবং রহস্যময় পোঁটলার মধ্যে কি আছে দেখার জন্য সকলেই উন্মুখ হয়ে উঠলো। কিন্তু মজার ব্যাপার হ'ল পোঁটলাটা খুলে দেখার সাহস কারো হচ্ছে না। সকলেই যেন একটা ভৌতিক বিস্ময়ে অভিভূত, চোখে মুখে ভয়ার্তের ছায়া।

শেষে সকলেই ভরতকে পোঁটলা খুলতে বলল। অগত্যা ভরত এগিয়ে গেল। ঠিক যেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সাপের গর্তে হাত দিতে যাচ্ছে ভরত। তার পোঁটলা খোলার দৃশ্যটা রুদ্ধশ্বাসে দেখতে দেখতে হঠাৎ অস্বস্তিকর পরিবেশের মাঝে এক সাথে সকলে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, ভাং-ভাং—সিদ্ধি-সিদ্ধি।

ভরত সকলের দিকে তাকাল। ওর চোখের চাউনি দেখেই লোকগুলি বুঝল কিছু বলতে চায় সে। ভরত বলল, ভাং তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু এটা এলো কোত্থেকে ?

সত্যি তো এ কথাটা কারো মাথায় আসে নি। পদ মিস্ত্রি বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে এটা ভূতের ভাং'।

কথা শুনে ধমকে উঠল ভরত। 'ভূত কখনও ভাং খায় ? এটা নিশ্চয় বাবা ভোলানাথের প্রসাদ।

ভরতের কথায় সায় দিল কুলিরা। কিন্তু মনের মধ্যে রহস্যটা থেকেই গেল। কিছুক্ষণের জন্য কাজ বন্ধ হলেও আবার কাজে হাত লাগল তারা। ভরত বলল, 'যাবার সময় ভোলাবাবার প্রসাদ নিয়ে যাবি। আমি একটু চা খেয়ে আসছি।'

সূর্য যখন অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই কাজ বন্ধ হ'ল। কুলিরা একে একে জড় হল হলঘরে। কুড়ুল, শাবল, কোদাল, ঝুড়িগুলি এক কোণায় রেখে হাতমুখ ধুয়ে এসে বসল।

পদ মিস্ত্রি বলল, 'তা হলে বাবার প্রসাদটা দিন এবারে। ভরত ভাংয়ের গুলি পাকিয়ে পাকিয়ে সকলের হাতেই দিল। বেশ ভক্তির সাথেই তারা ভাং উদরস্থ করে মজুরি চাইল।

ভরত বলল, 'একটু বসতে হবে। নলিনবাবু টাকা আনতে গেছে।'

দেখতে দেখতে ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেল নলিনবাবুর পাত্তা নেই। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। অপেক্ষামান কুলি কামিনগুলির কিন্তু এখন আর ঘরে ফেরার তাড়া নেই। মুখে একটা মৌনভাব দেখা যাচ্ছে। শান্ত দ্বিধাহীন চোখের পাতাগুলি জড়িয়ে আসছে ধীরে ধীরে। কেউ কোন কথাও বলছে না। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ওদের মধ্যে হঠাৎ একটা হাসির জোয়ার দেখা দিল। এক সাথে হাজার হাজার প্রেত যেন খিল খিল করে হেসে উঠল।

দেখতে দেখতে সেই ভয়ংকর বাড়িটাকে গাঢ় অন্ধকারের কালো ছায়া গ্রাস করে ফেলল। জানলা দরজার পাল্লাগুলো বাতাসে ক্যাচ্ ক্যাচ্ শব্দ করে দোল খেতে লাগল। আর কুলিগুলোও তালে তাল রেখে অদ্ভুত বিশ্রীভাবে গোঙানি সুরু করে দুর্বোধ্য ভাষায় গান ধরল।

দেখে মনে হচ্ছে একটা আসুরিক শক্তি যেন ওদের শিরায় শিরায় শিহরণ জাগিয়ে স্বর্গীয় আনন্দ দিচ্ছে। মনের সুপ্ত প্রবৃত্তিগুলো নাচের তালে তালে জেগে উঠছে, ফলে মাতালের মত একে অন্যের দেহ জড়িয়ে ধরছে। আর ভরত সেই জ্যাকসন সাহেবের মধ্যযুগীয় খাটে বসেই আপন মনে বিড়বিড় করে বলছে, 'আয়। দেব—নিশ্চয়ই দেব। আমার কেউ নেই রে, কেউ নেই! আহা কি রূপ! নিটোল কাল দেহ, ছুঁচলো চিবুকের উপর খাড়া নাক, টানা টানা চোখের উপর সোনালী টিপ, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।' কথাগুলো বলতে বলতেই খাট থেকে উঠে দাঁড়াল ভরত আর তখনই কার যেন একটা কালো বেণী আলতো ভাবে গায়ে এসে লাগল। চাঁপা ফুলের একটা মিষ্টি গন্ধ অনুভব করল সে। আরো কয়েক পা এগিয়ে গেল আর তখনই অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখল। যুবতীর দেহ থেকে মাকড়সার জালের মত শাড়িটা বাতাসে উড়ে গিয়ে সকলকে ঢেকে দিল। ধোঁয়াটে অন্ধকারে পাক খেতে খেতে মানুষগুলো তখন যুবতীকে ঘিরে ধরল। এ দৃশ্য দেখে ভরত কয়েক

পা পিছিয়ে ধুপ করে খাটের উপর বসে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তেই হলঘরটায় কাপড় খুলে সমস্ত মানুষগুলো অদ্ভুতভাবে শুয়ে পড়ল।

একটা অদৃশ্য শক্তি যে ওদের ওপর ভর করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই ভূতুড়ে ভাং খাওয়ার পর থেকেই ওরা নিজেদের সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। দেখতে দেখতে কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকগুলি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় ওদের দেখলে মনে হত কবরের তলার অতল স্পর্শ অন্ধকারে যেন ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে।

ভরতের চোখেও ঘুম নেই। সে শুধু মোহাচ্ছন্ন হয়ে খাটের উপর কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। কানে এল অস্পষ্ট আওয়াজ। শকুনের দৃষ্টিতে দেওয়াল আলমারির দিকে তাকাল ভরত। দেখল নিকষকালো অন্ধকারেই আপনা থেকে আলমারির পাল্লা দুটো খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা পচা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরময়। মনে হ'ল কেউ যেন আলমারি থেকে কিছু বার করছে হঠাৎ জ্বলজ্বলে দুটো চোখ অদ্ভুতভাবে তাকাল ওর দিকে। সে দৃষ্টি এতো ভয়ংকর যে ক্ষণিকের মধ্যে ভরতের সমস্ত শরীর সংকুচিত হয়ে গেল।

কিন্তু এর পর ভরত যা দেখল, তা যেমনই ভীতিপ্রদ তেমনই বিস্ময়কর।

আস্তে আস্তে ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠল। দুটো শীর্ণ ভাসমান হাত কড়িকাঠ থেকে মেঝে পর্যন্ত বিরাট একটা মাকড়সার জাল ঝুলিয়ে দিল। পরক্ষণেই সেই ভাসমান হাত দুটো ঘুমন্ত মানুষ-গুলিকে স্পর্শ করল। তারপরই দেখা গেল তাদের দেহ থেকে এক একটা অদ্ভুত আকারের খুদে খুদে মানুষ বেরিয়ে ভাসতে ভাসতে ঝুলন্ত মাকড়সার জালে মাছের মত আটকে যেতে লাগল।

দৃশ্যটা দেখে ভরতের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। মুণ্ডু কাটা ছাগল যেমন পা ছোঁড়ে তেমনি পা ছুঁড়ছে ভরত। ওর চোখের সামনে যেন মৃত্যুর পর্দা ভেসে বেড়াচ্ছে। ভাবছে এর পর হয়ত ওর দেহ থেকেও একটি খুদে মানুষ বেরিয়ে আসবে। চোখ বন্ধ হয়ে গেল ভরতের কিন্তু হঠাৎ যেন

কাদার মত কি একটা পদার্থ ওর মুখে কে যেন ছুঁড়ে মারল। তাকাল ভরত। চোখ পিটপিট করে কাদার মত জিনিসটা দেখতে গিয়ে গা শিরশির করে উঠল। জমাট বাধা রক্ত। রক্তের তাল। সেই ভাসমান অদ্ভুত হাত দুটো পাক খেতে খেতে সারা ঘরময় রক্ত ছড়াচ্ছে। একটু পর তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত সাদা সাদা নখ দিয়ে মানুষ ভর্তি মাকড়সার জালটা গুটিয়ে ঝড়ের বেগে হাত দুটো বেরিয়ে গেল।

হাত দুটো অদৃশ্য হতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ভরত। যাক আমার ঘাড় মটকাল না। আমিই তা হলে জীবিত থাকলাম। গুটিসুটি হয়ে শুয়ে শুয়েই আগাগোড়া পুরো ব্যাপারটাই ভাবছিল ভরত। এ অবাস্তব অবিশ্বাস্য ঘটনা কেউ কি বিশ্বাস করবে? এ ভাবে ঘটনাটা যখন বোঝবার চেষ্টা করছে ঠিক তখনই ভরতের কানে এল গাছকাটার শব্দ। কিন্তু এ সময় গাছকাটার রহস্যটা কি? কারা গাছ কাটছে? একটা চাপা উত্তেজনা বুকে নিয়ে খাট থেকে নেমে অন্ধকারেই পথ হাতড়ে হাতড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অস্পষ্ট ছায়া ছায়া বহু কুলিদের পদধ্বনি আর ফিসফিস আওয়াজে মনে একটা সীমাহীন যন্ত্রণা অনুভব করল ভরত। বুঝল বিনায়ক ওর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করছে তা না হলে এ ভাবে লোক লাগাত না।

কুলিদের প্রতি বেশ ক্রুদ্ধ ভাবেই খানিকটা এগিয়ে গেল ভরত। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, খবরদার, কেউ কাজ করো না। আমার সাথে বিনায়কর চুক্তি আছে। কিন্তু ওর কথায় কাজ থামল না, ফলে অশ্লীল ভাষায় কুলিগুলোকে গালাগালি দিতে লাগল ভরত।

কয়েক মিনিট এ ভাবেই চলল। তারপর ওর বাকরোধ হয়ে গেল এবং বেশ বুঝতে পারল সাঁড়াশির মত দুটো হাত দিয়ে কে যেন গলায় চাপ দিচ্ছে।

ভরত সেই অদৃশ্য শক্তির সাথেই ধস্তাধস্তি করছে অথচ তার দেহে কোন আঘাতই লাগছে না। এ যেন ছায়ার সাথে কুস্তি করা। দৃশ্যটা যখন চরমে উঠেছে ঠিক তখনই অদৃশ্য শক্তি পেঁজা তুলোর মত শূন্যে ভাসিয়ে মৃত গাছটার কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিল ভরতকে।

গতকালের নৈরাশ্যমণ্ডিত মুহূর্তগুলো এখনও নলিন ভজনের মন থেকে লুপ্ত হয়ে যায় নি। সাত সকালেই নিস্তব্ধ বাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে ছায়াবৃত ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। গতকালের পরিস্থিতিটা ছিল সাংঘাতিক রহস্য আর উদ্বেগে ভরা। আজ যাতে আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য প্রস্তুত হল দুজনে। খুব সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে লাগল। ওদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন কোন অমঙ্গলের অপদেবতার মুখোমুখি হচ্ছে ওরা।

মোহরটা হাত ছাড়া হয়ে যাবার পর থেকেই যুক্তি তর্কে সারাটা রাত ওদের কেটেছে। সেই রহস্যটাই এখনও মনের আলো আঁধারীতে খেলা করছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে ওরা এতো মশগুল ছিল যে গতকাল কুলিদের টাকা দেবার কথাটাও মনে ছিল না। ফলে সারা রাত চিন্তা করে নলিনের এটাই মনে হয়েছে, যে লোকটি মোহর নিয়ে উধাও হয়েছে, নিশ্চয়ই সে খুনী ডাকাত। সম্ভবত সমুদ্রের ধারেই কোন ভাঙা বাড়িতে আত্মগোপন করে আছে।

ভজনও নলিনের কথা উড়িয়ে দিতে পারল না। কারণ তার ধারণা একটা মোহর যখন পাওয়া গেছে, তখন আরো মোহর আছে। বিশেষ করে এ ধরনের ভূতুড়ে বাড়িতেই ধন-রত্ন লুকিয়ে রাখা ডাকাতরা বেশি পছন্দ করে। কিন্তু গতকাল যা ঘটেছে তা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। একটা লিকলিকে মানুষ এক পলকে দুজনকে ধরাশায়ী করে মোহর নিয়ে যাবে ভাবা যায় না। এটা একমাত্র ভূতেই পারে।

নলিন বলল, আমি কিন্তু ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না!

—আমি করি। ভূতের অস্তিত্ব আছে। আমি দেখেছি। কথাটা বলেই অন্য দিকে মুখ ফেরাল ভজন।

এখানে একটা জিনিস পরিস্কার হয়ে গেল, ওদের দুজনের মন বিপরীত মুখী। তা হলে সাত-সকালে এক সাথেই কেন ওরা ভূত-কুঠিতে এসেছে? আসলে ওরা একে অন্যকে বিশ্বাস করে না। ভজন ভাবে, নলিন মোহর পেলে আমাকে দেবে না। নলিন ভাবে, ভজন মোহর

পেলে আমাকে জানাবেও না। কাজেই কাছাকাছি থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। ফলে দুজনেই দুজনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলেছে।

ওরা এগিয়ে যেতে যেতে দেখল ভূত-কুঠির নোনাধরা দেওয়ালের ক্ষতের উপর সকালের রোদ এসে পড়েছে। মানুষ প্রমাণ জংলা ঘাস আর কাটা গাছগুলি বালির উপর ছড়িয়ে আছে। এক রাতেই পরিবেশটার বেশ পরিবর্তন হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। ঘাসের আচ্ছাদনে ঢাকা উঠোনটা পর্যন্ত পরিষ্কার। সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই শ্যাওলা আর ছাতাপড়া ভ্যাপসা গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল ভজনের। সেই মুহূর্তেই ভূত দেখার মত কি যেন দেখে চমকে উঠল নলিন। বলল, ওটা কি রে ভজন।

—মানুষ বলেই তো মনে হচ্ছে। একি! এ যে ভরত। নলিন দেখবি আয়, ভরত বোধ হয় মরে গেছে।

—তাই তো। বলেই ঝুঁকে ভরতকে দেখতে লাগল নলিন। না, মরে নি। নিঃশ্বাস পড়ছে এখনও।

—কিন্তু ও এ ভাবে পড়ে আছে কেন? কথাটা বলেই বিস্ময়ে নলিনের দিকে তাকাল ভজন।

নলিন বলল, সারারাত বোধ হয় কুলি খাটিয়েছে। ডাকল ভরতকে। ভরত এই ভরত। নলিনের ডাক কানে গেলেও ভরত উঠল না বরং পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

ভজন বলল, দেখলি বেটার কাণ্ড। বলেই একটা ঘাঁসফুল ছিঁড়ে ভরতের নাকে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। ব্যস, আর যায় কোথা—ধড়পড় করে উঠে বসে সামনে ওদের দুজনকে পেয়ে ভীষণ রেগে গেল ভরত।

নলিন বলল, অত চেঁচাচ্ছিস কেন?

—চেঁচাব না। সন্ধ্যে হতে গেল কুলিগুলোকে টাকা দিতে হবে না?

ভরতের কথা শুনে নলিন ভজন বিস্ময়ে তাকাল। তারপর প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠল, সন্ধ্যে কোথায় এখন তো সকাল সাতটা।

কথাটা শুনে সমস্ত কিছুই স্বপ্নের মত মনে হল ভরতের।

তিমিরান্ধকারে খুদে খুদে মানুষগুলির জালে আটকে যাওয়া এবং প্রেতমূর্তির আগুন ঝরা দৃষ্টিতে একবার ঘর আলোকিত হয়ে সব কিছুই অস্পষ্টভাবে মনের মাঝে ভেসে আসছে।

তারপর এক সময় সূক্ষ্ম চিন্তার অবকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মত সমস্ত দৃশ্য চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল ভরতের। মুহূর্তে যেন একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেল দেহের ওপর। সুপ্ত আত্মা রাতের বিভীষিকা ভেদ করে মনে করিয়ে দিল ওরা ওপরে আছে। বাস্তবের স্পর্শে স্বপ্নের ঘোর কেটে যেতেই ছুটে ওপরে উঠে গেল ভরত। কুলিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল 'মমী'র মত নিথর নিঃসাড় হয়ে ওরা সব পড়ে আছে।

ক্ষণকালের মধ্যেই মুখের ভাব শান্ত দৃঢ়তা প্রকাশ পেল ভরতের। কুলিদের নাম ধরে ডাকল। কোন উত্তর নেই। কুলিদের দিকে তাকিয়ে গা ছমছম করে উঠল ভজন আর নলিনের। সত্যি এ অবস্থায় ওদের দিকে তাকালে যে কোন লোকেরই মনে হবে, এই বিশাল বাড়ির ছায়াবৃত কক্ষে কতকগুলি অলৌকিক সত্ত্বা দিগন্তের অন্তরাল থেকে নেমে এসে যেন পরম তৃপ্তিতে বহু যুগ ধরে ঘুমিয়ে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভরত নির্বোধের মত কুলিদের নিরীক্ষণ করছিল। হঠাৎ তার চোখ দুটো রাগে গনগনে আগুনের মত লাল হয়ে উঠল। বার কয়েক জোরে জোরে নিশ্বাস ছেড়ে এলোপাথাড়িভাবে কুলিগুলোকে লাথি মারতে লাগল। ভরতের পদাঘাতে ঘুম ভাঙ্গল কুলিদের। অন্ধকার গহ্বর থেকে যেন উঠে বসল সকলে। বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টিতে মিনিট কয়েক তাকাল ওদের দিকে। তারপর জানলায় সোনালী রোদের ঝিলিক দেখে সকলে খুশিতে কলরব করে উঠল। পদ মিস্ত্রি কিন্তু এখনও বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে ভরতের দিকে। নিজের অস্তিত্বকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না পদ।

ভরত বলল, অমন করে দেখছিস কি ? কাজে লাগবি না ? ভরতের কথা শেষ হতেই হুড়মুড় করে সকলে নিচে নেমে গেল।

কুয়াশা ঘেরা রাতে শিশির ভেজা বালিতে পা রাখতেই সমুদ্রের দক থেকেকি একটা আঁশটে গন্ধ বাতাসে ভেসে এল। নিদ্রাচ্ছন্ন চোখের ঘোর তখনও কাটেনি, তাই বোধ হয় বিস্মিত দৃষ্টির অন্তরালে কিছু বোঝার চেষ্টা করছে কুলিগুলো।

কিছুক্ষণ নীরব।

হঠাৎ কে যেন বলল, আমাদের কাজ কারা করে গেল ? একটু ঘুমিয়ে পড়েছি বলে অন্য লোক লাগাবে ভাবাই যায় না।

হ্যাঁ—হ্যাঁ এটা অন্যায়।' সকলেই এক বাক্যে কথাগুলো বলল।

দেখতে দেখতে ওদের মনের আকাশে কালোমেঘ ধূমায়িত হয়ে উঠল।

ভরতকে ঘিরে ধরল সকলে। 'টাকা দিন চলে যাব। অন্য লোক দিয়ে যদি কাজই করাবেন আমাদের ডাকার কি দরকার ছিল ?

ভরত কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। কারণ নিজেও আশ্চর্য হয়ে গেছে। এক রাতে লোক লাগিয়ে বাড়িটাকে প্রায় বাসযোগ্য করে ফেলেছে। কিন্তু কাজটা করলে কে ?

ভরত যখন চিন্তায় অস্থির তখনই সামনে এসে দাঁড়াল পদ মিস্ত্রি। বলল, সন্ধ্যা হয়ে গেল, বাড়ি যাব টাকা দিন। কাল থেকে কেউ আমরা আপনার কাজে আসব না।

ভরত বলল, টাকা দিচ্ছি কিন্তু এখন তো সন্ধ্যে নয় সকাল সাতটা।

আমরা কি তা হলে গত রাতে এখানেই ছিলাম ?

ভরত বলল, তাই তো মনে হচ্ছে।

কথাটা কানে যেতেই কুলিদের মনে গভীর পরিবর্তন ঘটতে

লাগল। ওদের দীপ্তিহীন চোখের সামনে ভেসে উঠল রাতের দৃশ্যগুলো। ভাং খাওয়ার পর থেকেই যেগুলো ঘটেছিল।

কুলিদের হাবভাব এবং কথার দুর্বলতা দেখে ভজন বুঝল ঘটনাগুলো এতো আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যে কিছু উপলব্ধি করার আগেই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিল ওরা।

নলিন বুঝল কিছু একটা ঘটেছে কিন্তু সেটা যে কি তা বুঝতে পারল না। তাই রাশিকৃত চিন্তা মাথায় নিয়ে বিনায়কের কাছে গেল। ভাবল এমনও তো হতে পারে ভরতের কাজে সন্তুষ্ট হতে না পেরে বিনায়ক নিজেই রাতে লোক লাগিয়ে কাজ শেষ করেছে। কাজেই এ ব্যাপারটা জানা দরকার।

বিনায়কের বাড়িটা বন্তর পাহাড়ের কাছাকাছি। জায়গাটা বেশ নিরালা। বনেদী পরিবারের ঠাট বজায় রাখতে ঠাকুর চাকর দারোয়ান মালির কমতি নেই, লোকজনের আনাগোনাও লেগেই থাকে। কাজেই মানুষের কোলাহল আর বাচ্চাদের চেঁচামেচিতে অধিকাংশ সময় বাড়িটা গম্‌গম্‌ করে। বিনায়কের বাবা পুরীর নাম করা ব্যারিস্টার। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁকে উদার হাতে ঢেলে দিয়েছেন অর্থ যশ প্রতিপত্তি। কিন্তু বিনায়ক সেই বিত্তের স্বাচ্ছন্দ্যেভরা সংসারে যেন একটা অবাঞ্ছিত ব্যাক্তি। পৈত্রিক ভদ্রাসনে বাস আর চার বেলা আহারের অংশীদার মাত্র। তবু বিনায়ককে সকলে ভালবাসে। অবশ্য সে ভালবাসাটা কোন গুণের জন্য নয়, ওর অসহায় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে।

লেখাপড়া শিখলে বিনায়ক বাবার মত হতে পারত কিন্তু তা না হয়ে যৌবনের প্রারম্ভেই নিস্পাপ প্রাণটা অসৎ সঙ্গে পড়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে সে নারীগত প্রাণ হয়ে উঠল। পিতার অর্থে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করে প্রায় শেষ মুহূর্তে থমকে দাঁড়াল। দেখল সামনে ভীষণ অন্ধকার অথচ বাঁচতে হবে। ফিরে এল আপন ঘরে। সুরু করল জমি কেনা বেচার ব্যবসা। বলতে গেলে পরিত্যক্ত বেলাভূমিই

ভাগ্য ফিরিয়ে দিল বিনায়কের। জমির দালালিতে রাতারাতি ভাগ্য ফিরে গেল তার, কিন্তু ভুল করল ভূত-কুঠি কিনে। এক ধাক্কায় বহু টাকা বেরিয়ে গেছে অথচ সে টাকাটা ঘরে তোলবার কোন পথই দেখতে পাচ্ছে না।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সকাল থেকে পিতা-পুত্রের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলছে।

বেশ উত্তেজিত ভাবে বিনায়কের বাবা যখন বললেন, ওটা যে একটা ভূতুড়ে বাড়ি তা তো সকলেই জানে। সেই অভিশপ্ত বাড়িটার পিছনে তুই টাকা ঢাললি কেন?

বিনায়ক সহজভাবেই বলল, আমি জেনে শুনেই অনিশ্চয়তার মধ্যে পা বাড়িয়েছি। আর কিছু বলবেন?

না। কথাটা বলেই গম্ভীরভাবেই চলে গেলেন ব্যারিস্টার সাহেব।

একটু পরেই নলিন গিয়ে দাঁড়াল বিনায়কের কাছে। একটা থমথমে ভাব দেখে বুঝল কিছু একটা হয়েছে। তবু বলল, কাল রাতে ভূত-কুঠিতে কি তুই লোক লাগিয়েছিলি?

কেন বল তো? কথা বলেই বিস্ময়ে তাকাল নলিনের দিকে।

কাজ তো প্রায় শেষ।

তা হলে তো একবার যেতে হয়। চল দেখি ব্যাপারটা কি। ওরা এসে ঢুকল বাড়ির মধ্যে। দেখল এক রাতেই বাড়ির চেহারাটাই বদলে গেছে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বিনায়ক ভরতকে ডেকে বলল, এতো কাজ করলি কি করে? যাক গে, এই নে টাকা।' পুরো হাজার টাকাই দিয়ে দিল সে।

কাজ না করেই টাকাটা পেয়ে ভরত ভীষণ অবাক হল। ওর ধারণা ছিল বিনায়ক অন্য লোক দিয়ে কাজ করিয়েছে কিন্তু তা হলে এ তো টাকা দিচ্ছে কেন? সত্যি কথাই বলল ভরত। আমরা কিন্তু রাতে কাজ করি নি।'

কথা শুনে বিনায়ক রেগে গেল। তা হলে কি ভূতে কাজ করল? ষড়যন্ত্রটা ভালই করেছিস। বাড়িটার তো বদনাম আছেই এরপর

তোদের ওই সব অদ্ভুত কথা শুনলে লোকে আর এ বাড়িতে বাস করবে?

ভরত বুঝল পরিস্থিতিটা খুবই জটিল, কাজেই টাকা নিয়ে কেটে পড়াই ভাল। কানে এল কুলিদের চিৎকার। তারা বেশ উত্তেজিত ভাবেই বলছে, ঝুড়ি কোদাল কিছু পাওয়া যাচ্ছে না বাবু।

কুলিদের কথা শুনে বিনায়ক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে ভাবতে লাগল কে নিতে পারে জিনিসগুলো আর তখনই তার মনে হল নিশ্চয়ই এসব ভজন, নলিনের কাজ। ওরাই লোক লাগিয়ে কাজ শেষ করে প্রমাণ করতে চায় এ সব ভূতুড়ে কাণ্ড। ওরা এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, তাতে যে কোন লোকই বলবে ভূতের কাজ।

ভীষণ জেদ চেপে গেল বিনায়কের মাথায়। না, কোন মতেই নলিনের কুটবদ্ধি ভজনের শয়তানির কাছে মাথা নত করবে না। বেশ চড়া স্বরেই বলল, যদি ভাল চাস, তাহলে ওদের জিনিষগুলো দিয়ে দে ভজন।

কি বাজে কথা বলছিস?

বলছি অবিশ্বাস্য ভূতের ভয় দেখিয়ে আমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়াতে পারবি না।

ভজনও রেগে গেল। তোর বাজে কথা শুনতে চাই না।

ঠিক আছে। দেখি জিনিসগুলো বার করতে পারি কিনা।

বিনায়কের মনে বদ্ধ ধারণা হয়ে গেছে ওকে জব্দ করার জন্য ভজন, নলিন কুলিদের জিনিসগুলো লুকিয়ে রেখেছে। বিনায়ক চলে যেতেই ওরাও চলে গেল। আর ভরত তখনও ঝড় লাগা মনে কুলিদের সাথে ঝগড়া করছে।

হঠাৎ কুলিরা বেপরোয়া কণ্ঠে বলে উঠল, জিনিসগুলো আমাদের চাই।

কথার মাঝেই অভয়পদ একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ভরতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা মুখ্য-সুখ্য মানুষ—যদি কিছু অন্যায় করে থাকি মাফ করবেন।

আমিও দুঃখিত। সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ কণ্ঠে উত্তর দিল ভারত। তারপর যথারীতি গাঁজার কল্কে পকেটে নিয়ে ভ্রূকুটি কুটিল চোখে চলে গেল। কুলিগুলো ভরতের হাবভাব দেখে খুবই বিরক্ত হল। তারপর ভৌতিক বাড়িটাকে পিছনে রেখে বকবক করতে করতে তারাও চলে গেল। নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে উঠল পরিবেশটা। মাঝে মাঝে শুধু বিদেহী আত্মার মর্মভেদী আর্তস্বর ভেসে ভেসে আসতে লাগল জানলা দরজার পাল্লার ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দের ভেতর থেকে।

কুলিগুলো যথারীতি বাড়িতে ফিরে এল। গত রাতে তারা যে বাড়ি যায় নি, তার জন্য কেউ চিন্তিত ছিল না। কারণ ওরা জানে অনেক সময় রাতেও কাজ হয়।

খুশি মনে ঢুকতেই কাচ্চা বাচ্চাগুলো তাদের বাবা-মার কাছে হৈ হৈ করে ছুটে এল। এর ভেতর কার একটা বাচ্চা ছুটে আসতে গিয়ে কোদালে চোট লেগে পড়ে গেল। তা দেখে বাচ্চাটার বাপ চেঁচিয়ে উঠল। তখনই নজর পড়ল কোদাল আর ঝুড়ির উপর। এ কি ! এ যে আমাদের সেই কাজের জিনিসগুলো। কে আনল ও গুলো ! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল লোকটি। অন্য কুলিরাও দেখল তাদের সকলেরই জিনিস বাড়িতে রয়েছে। এ ঘটনায় ওরা এত আশ্চর্য হয়ে গেল, যে ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। সব ঘটনাটাই যেন ভৌতিক ব্যাপার। ভাবল ভূত-কুঠিতে কাজ করতে যাওয়াই হয়ত ভূতগুলো রেগে গিয়ে ওদের ঘর পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। ওরা যে এসে ছিল তার প্রমাণ তো ওই কোদাল ঝুড়িগুলো !

ভূতের ওঝা জম্বু নুলিয়াকে ডাকল ওরা। সব কিছু শুনে বেশ চড়া সুরেই মন্তব্য করল জম্বু, বহুকাল ধরে সাহেব কুঠিতে ভূতগুলো বাস করছে, তাদের ভিটে ছাড়া করার অধিকার কারও নেই। জম্বুর ছেলে সীমা নুলিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, আছে। দুর্বলের উপর সবলরা চিরদিনই প্রভুত্ব করে। এই আমরা যারা সমুদ্রের ধারে দু'শ বছর ধরে আছি আর দু'দিন পর আমাদেরই ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হবে !

তার মানে ?

খুব সোজা। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নোটিশ দিয়েছে বস্তি ভেঙ্গে ফেলা হবে। ওদের চোখে তো আমরাও এক ধরণের ভূত।

তাহলে কি করা উচিত।

ওই ভুত-কুঠির ভূত যেমন তোমাদের জানিয়ে দিল, ও বাড়িতে কারও যাওয়া চলবে না। আমাদেরও চেয়ারম্যানকে জানিয়ে দিতে হবে বস্তি উচ্ছেদ চলবে না।

জম্বু ছেলের কথায় বিরক্ত হল, কারণ ভূতের প্রায়শ্চিত্ত করলে ওর কিছু রোজগার হবে। এ সময় যত সব বাজে কথা। অকস্মাৎ ভয়ংকর হয়ে উঠল জম্বুর চোখ মুখ। বেশ তেজের সাথেই বলল, ভূত-কুঠির ভূতদের সন্তুষ্ট করতে হবে। যদি না কর তোমাদের ছেলেগুলো এক একটা করে ভূতের পেটে যাবে।

জম্বুর কথা মেনে নিল সকলেই। সে রাত্রেই সমুদ্রের তীরে ভূত তাড়াবার আয়োজন করা হ'ল। প্রথমে তিনটে খেজুর ডালে লাল শালু বেঁধে দেওয়া হল। তারপর সেগুলো বালিতে পুঁতে তার সামনে মদ আর খিচুড়ির ভোগ দেওয়া হ'ল। জম্বু অদ্ভূত ভঙ্গী করে মন্ত্র পড়তে লাগল। পুজো শেষ হলে সকলেই অপদেবতার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। এভাবে মিনিট কয়েক থাকার পর মশাল হাতে সেই জলন্ত পাতাগুলোকে কেন্দ্র করে আড়াই পাক ঘুরলো। এরই মাঝে জম্বু দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে কয়েকটা আধপোড়া মাছ ভূতের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে একটা মশাল নিয়ে ভূতেদের মুখে আগুন দিল। তারপর এক সাথেই ঊর্ধশ্বাসে বস্তির দিকে ছুটতে লাগল সকলে। ওরা যেন নিদারুণ একটা ভয় হাতে করে ছুটছে। যে পিছনে ফিরে তাকাবে পাষণ্ড ভূত তারই প্রাণ কেড়ে নেবে। এ ভাবেই অন্ধকারে কুঁড়েতে ঢুকে যে যার ঝাপ বন্ধ করে দিল। এতক্ষণে ক্লান্তি মাখা মুখে শান্তি এল ওদের। বাঁশের ডগায় কেরোসিনের লণ্ঠনগুলো আলো ছায়ায় দুলতে লাগলো সারারাত।

এ ঘটনার পর মাসখানেক কেটে গেল। কুলিরা কেউ ভূত-কুঠিতে

কাজে এল না। বিনায়ক ভাবল, নলিন আর ভজনই বোধ হয় কুলিদের মনে একটা ভৌতিক ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছে। সে জন্যেই কেউ এ বাড়িতে কাজ করতে রাজি নয়। অগত্যা বাইরে থেকে লোক এনে বাড়ির বাকি কাজ করাতে হ'ল বিনায়ককে।

এখন বাড়ির চেহারাটাই পাল্টে গেছে। দেখলে আর ভূতের বাড়ি বলে মনেই হয় না। বেশির ভাগ সময়ই বিনায়ক পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে তাস পাশার আড্ডা বসাল। নলিন ভজনকে এ আড্ডায় ডাকল না বিনায়ক। এতে ওরা দুজনেই ভীষণ অসন্তুষ্ট। শেষে বিনায়কই নিজের ভুল বুঝতে পেরে ওদের কাছে গেল। বলল, বাড়িটায় একটা হোটেল বা লজিং হাউস খুলতে হবে। তোরা যদি রাজি থাকিস তাহলে সন্ধ্যের সময় একবার আসবি। আলোচনা করব।

ওরা বিনায়কের প্রস্তাবে রাজী হল। কারণ ওরা জানত ওদের বাদ দিয়ে এ বাড়িতে বিনা যদি একা কিছু করতে যায়, তার ফল ভাল হবে না।

দিনের শেষে আঁধার নামল। রোজের মত বিনায়ক এসে বসল জ্যাকসন সাহেবের সেই অভিশপ্ত চেয়ারটায়। ইদানিং বাড়িটার দিকে ভীষণ একটা আকর্ষণ সে অনুভব করে। মনে হয় ইঁট কাঠ পাথরের বুকে জমে থাকা একটা দীর্ঘশ্বাস যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

বোতল খুলে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল বিনায়ক। তারপর সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল পরম তৃপ্তির সাথে। ঠাণ্ডা বাতাসটা

বেশ ভালই লাগছে। মদ্যপান করতে করতে চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে বিনায়কের। হঠাৎ মনে হল, এখন নলিন ভজন যদি বেশি সুবিধা চায় তাহলে কি করা যাবে? ব্যাপারটা বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু ভেবে যখন কোন কুল-কিনারা পেল না, তখন আবার গ্লাসে চুমুক দিল। এক ঝলক ঝোড়ো বাতাস ঘরে ঢুকে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে মোমবাতির আলোয় কাঁপন ধরাল। মোমটা নিভে যেতে পারে ভেবে মোমদানিটা নিচে নামিয়ে রাখল বিনায়ক। ঠিক তখনই কানে এল খস্‌খস্‌ পায়ের আওয়াজ। বিস্ফারিত চোখে দরজার দিকে তাকাল বিনায়ক। দেখল শীর্ণকায় এক বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে।

বৃদ্ধকে দেখে বিনায়ক বোতল আর গ্লাস আড়ালে রাখল। তার পর সম্ভ্রমের সাথেই বসতে বলল বৃদ্ধকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে অনেক কষ্টে লাঠিটা পাশে রেখে চেয়ারে বসল বৃদ্ধটি।

তার দিকে তাকাতেই মনে হ'ল বিনায়কের মনে দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে বৃদ্ধের দৃষ্টি যেন গ্রাস করতে চাইছে তাকে। একটু পর বৃদ্ধের শুষ্ক বিবর্ণ মুখটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। খুবই অসহায় বলে মনে হচ্ছে ওঁকে।

—আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন? বিনায়ক কথাটা বলল।

—হ্যাঁ। আমার যে পাঁচ হাজার টাকা তোমার কাছে গচ্ছিত আছে, ওটা আমার আজই চাই।

—অত টাকা নিয়ে কি করবেন?

—যার টাকা তাকে ফেরৎ দিয়ে দেবো।

—ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না আপনার কথা।

—ও টাকা আমি বাদল মুখুজ্যের বাস কোম্পানিতে কাজ করার সময় চুরি করেছিলাম। কিন্তু তুমি বিশ্বাস ক'র বাবা, সেই চুরি করার পর থেকে এক মুহূর্তও আমি শান্তি পাই নি। অন্যায় আর পাপের কালো ছায়া আমার মনকে অহরহ অন্তহীন যন্ত্রণা দিচ্ছে।

যে ভাবে পার টাকাটা আমাকে না হ'ক বাদল মুখুজ্যেকে দিয়ে দিও বাবা।

ঠিক আছে আমি কাল সকালে বাদলকে টাকা দিয়ে আসব।

বিনায়কের কথা শুনে বিহ্বল দৃষ্টিতে হলঘরটার দিকে তাকাল বৃদ্ধ। তারপর শীতল রাত্রির বুকে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলে নিশব্দে বেরিয়ে গেল।

বিনায়ক সহানুভূতির স্বরেই বলল, আমি কি যাব আপনার সাথে, অন্ধকারে যেতে পারবেন?

কোন উত্তর পেল না বৃদ্ধের কাছে থেকে। টাকা দিতে হবে শুনে মনটা খিঁচিয়ে উঠল বিনায়কের। আপন মনেই হাসতে হাসতে বলল, দেবো বললেই কি আর টাকা দেওয়া যায়? টাকা দেবো না ছাই দেবো।

কথাটা বলার সাথেই বিনায়কের মুখের রংটাও যেন ছাইয়ের মত হয়ে গেল। উন্মুক্ত কফিনের ভেতর থেকে একটা বিশ্রী গন্ধ ভেসে এসে ওর দেহে যেন প্রবেশ করল। একটু পরেই সেই বিশ্রী গন্ধটা ঘন নিশ্বাসের সাথে পাক খেতে খেতে পাকস্থলীতে জমা হতে লাগল। সিগারেট ধরিয়ে নিথর রাত্রির শীতল বাতাসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাইল বিনায়ক। কিন্তু মাথার ভেতরটা টন টন করে উঠল। যন্ত্রণা ক্লিষ্ট মুখে আপন মনেই বলল, না টাকা আমি ফেরৎ দোব না।

একটু পরেই নলিন আর ভজন ঘরে ঢুকল। পেছনে পড়ে রইল ভয়ংকর অন্ধকার আর সমুদ্রের গর্জন। বিহ্বল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে বিনায়ক তাকাল ওদের দিকে. বসতে বলল ইঙ্গিতে। আর তখনই ভজন নলিন লক্ষ্য করল বিনায়কের মধ্যে একটা অসহায় ভাব। খুব ভয় পেলে মানুষের চেহারা যেমন হয় তেমনি। ওরা বসতেই একটা বিশ্রী গন্ধ বাতাসে ভেসে এসে ওদের নাকে লাগল।

কি বিশ্রী গন্ধ মাইরি। নলিন কথাটা শেষ করতেই বিনায়কের দিকে তাকিয়ে ভজন বলল, একটা খবর শুনেছিস বিনা!

—কি খবর ?

—বলাই কুণ্ডু মারা গেছে ! আজ দুপুরে বরুণ ঘোষের লরি চাপা পড়ে ।

কথাটা শুনে হো হো করে হেসে উঠল বিনায়ক । আচ্ছা, গ্যাস মারলি মাইরি । পাঁচ মিনিট আগেও যে লোকটি আমার কাছে বসে-ছিল সে লোক দুপুরে মারা গেছে ?

নলিন বলল, ভজনের গ্যাসের থেকেও তোর গুলটা ভারি মনে হচ্ছে । আচ্ছা, গুল মারলি যা হোক ।

বিশ্বাস হচ্ছে না, ওই দেখ বলাই কাকার লাঠিটা এখনও পড়ে আছে ।

বিনায়ক বলাই কুণ্ডুর লাঠিটা দেখিয়ে দিল । ওরা দুজনেই লাঠিটা ভাল করে দেখল । হ্যাঁ, এটা বলাই কুণ্ডুরই লাঠি । কিন্তু বিনায়কের কথা বিশ্বাস করা যায় না । কারণ বলাই কুণ্ডুর লাশ এখনও শ্মশানে পড়ে আছে ।

নলিন বলল, বলাই কুণ্ডুর লাশ দেখলেই তো তোর সন্দেহ মিটে যাবে । আমাদের কথা যখন বিশ্বাস হচ্ছে না, দেখবি চল ।

যে বলাই কুণ্ডু টাকার কথা বলে গেল সে কি মৃত ! ভাবতে ভাবতে বিনায়কের রক্তের চাপ বাড়তে লাগল । তবু বলল, আমি যাব । বিবর্ণ মুখে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে নরকের অন্ধকার থেকে পলাতক আত্মার মত বিনায়ক ওদের সাথে বেরিয়ে গেল ।

ওরা শ্মশানের বুকে পা রাখতেই কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠল । নীরবে এসে দাঁড়াল বস্ত্রাচ্ছাদিত শবদেহের পাশে । হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে বলাই কুণ্ডুর কাপড় সরে গেল মুহূর্তে । অদৃশ্য আত্মার গোঙানির মত অদ্ভুত শব্দ করে দু-হাতে চোখ ঢেকে সরে দাঁড়াল বিনায়ক । আর সবচেয়ে আশ্চর্য সেই বিশ্রী গন্ধটা থেমে থেমে বিনায়কের শ্বাসনালী থেকেই বেরিয়ে আসতে লাগল । মুহূর্তে

শ্মশানে দাঁড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীটাকেই একটা স্বপ্নময় কুহেলি বলে মনে হত লাগল বিনায়কের।

গত রাত্রের পঙ্কিল আবহাওয়া কাটিয়ে শীতের সূর্য আলো ছড়িয়ে দিয়েছে সমুদ্রের বালুতটে। ঝাউয়ের পাতায় শিশির ঝরছে, আর সেই নবোদিত সূর্যের আলোয় ঘুম ভাঙ্গা পাখিগুলো, গা ঝাড়া দিয়ে কলরবে মাছের সন্ধান করছে। শতছিন্ন লেংটি পরা নুলিয়ারা মাছ ধরা ডিঙ্গিগুলো তীরের দিকে টেনে আনছে। তারপর জাল ঝেড়ে ঝুড়িতে মাছ ভর্তি করে তাদের বৌ-মেয়েরা বাজারে চলে যাচ্ছে। যেখানে জাল ঝাড়া হয় পাখিগুলো সেখানেই বেশি ভিড় করে।

কারণ কুঁচো চিংড়ি আর নানা জাতের ফেলে দেওয়া মাছ তখন তাদের দখলে।

পুরীর স্বর্গদ্বারের এই শ্মশানের ঢালু জায়গাটা যেটা সমুদ্রের ঢেউ পর্যন্ত ছুঁয়ে আছে, সে জায়গায় দাঁড়ালে অনেক রহস্যই চোখের সামনে ভেসে উঠে। মানুষকে দেখা যায় নানা ভাবে, নানা রূপে। জন্ম-মৃত্যু, আহার আর কামনার আবর্তে সবাই যেন হাবুডুবু খাচ্ছে।

নন্দডোম শ্মশানের ফেলে দেওয়া মৃত ব্যক্তির বিছানা বালিশ নিয়ে সাত সকালেই ঘাঁটা ঘাঁটি করছে কারণ নন্দ জানে ও গুলো শয্যাভবনে বিক্রি করলে যা পাবে তাতে অন্তত দু'চারদিন চলে যাবে। আর দোকানদার ভাবে মড়ার বিছানায় লাভ বেশি। ও গুলোই নতুন খোলে ভরলে ডবল দাম পাবে।

এ ভাবেই দিনের সূর্য মানুষের জীবনে অহরহ বাঁধা ধরা ছকে ভাঙ্গা গড়ার খেলায় মত্ত। যে মেয়েটি ছাপা শাড়ির আড়ালে দুরন্ত যৌবনকে ঢেকে একটি যুবককে মন্তব্য করল, তার-এ ন্যাকাপনা করার অর্থ কি? ও তো সুখের সংসারে সোনার পাখি। ধনী পিতার শিক্ষিতা রূপসী।

মেয়েটির নাম রুবী দত্ত। বাবা ইঞ্জিনিয়ার। পুরীতে এসেছে ছুটি কাটাতে। সমুদ্রতটে আসার আগে মেয়েটি বুঝতে পারেনি বালুবেলায়

মুলিয়াদের জাল ছাড়া অন্য জালও পাতা থাকতে পারে। নলিনের প্রেমের জালে আটকে গেছে রুবী। দূর থেকে তাই নলিনকে ডাকল, এই যে আমি এখানে। কথাটা বলতে গিয়েই গোলাপী গালে টোল পড়ল রুবীর।

নলিন এগিয়ে এল রুবীর কাছে। বলল, সেই ভোর থেকে সারা সী-বীচটা চষে বেড়ালাম, এত দেরী করলেন। এক নিশ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে কথাটা বলল নলিন।

—আমি দুঃখিত। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে। যাক রাতে আসছেন তো?

—আপনার ডাকে সাড়া না দিয়ে কি পারি।

—ডাকটা কিন্তু আমার নয়, বাবার। কথাটা বলেই ঢেউখেলান বিনুনীটা বুকের কাছে টেনে নিল রুবী। তারপর পায়ের নখে বালিতে দাগ কাটতে কাটতে লাজনত চোখে তাকাল নলিনের দিকে। পরমুহূর্তেই ঢেউয়ের বুকে পা রেখে ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে।

রুবিকে দেখার আগে অনেক কথা মনের মাঝে ভিড় করেছিল নলিনের। কিন্তু কাছে পেয়ে কিছুই বলতে পারল না সে। আসল ব্যাপারটা কি? নলিন রুবিকে প্রেমপাত্রী হিসাবে চায় কিন্তু কোন আয় নেই। অর্থ ছাড়া প্রতি মুহূর্তে অনর্থ ঘটবে। কাজেই কিছু একটা করতে হবে। বিনায়ক হোটেল খুললে তার অংশীদার হলে আয়ের পথ খুলতে পারে, তখন রুবীর কাছে মনের কথা বলা বোধ হয় ঠিক হবে। কাজেই আগে বিনায়কের কাছে যাই। এ ভাবেই বিনা, নলিন, ভজন যে যার কেন্দ্রে ঘুরছে।

বিনায়কের প্রাণ যেন ধিকধিক জ্বলছে। সেই অদ্ভুত বিশ্রী গন্ধটা ওকে অহরহ মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই বুঝে উঠতে পাচ্ছে না, গন্ধটা আসছে কোত্থেকে। ভাবল স্নান করলেই গন্ধটা চলে যাবে কিন্তু গেল না। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে গত রাতের

ঘটনাটা মন থেকে মুছে ফেলতে চাইল বিনায়ক। স্নান সেরে উষ্ণ কফি পান করে একটু আমার পেতে চাইল।

নিতাই দাস এসে দাঁড়াল। বলল, হোটেলের সমস্ত ফার্ণিচার এসে গেছে বাবু। মাল নামাতে হবে। চলুন, জিনিস দেখে নেবেন।

চল। বলেই লরি ড্রাইভার নিতাই দাসকে সাথে নিয়ে বিনায়ক এসে দাঁড়াল সেই প্রেত-ছায়াময় কুঠির হলঘরটায়। মাল নামিয়ে লরিটা চলে গেল।

নলিনও এসে জুটল বিনায়কের কাছে। দেখল হোটেল খোলার জন্য যা যা দরকার প্রায় সব কিছুই এসে গেছে। তারপর বিনায়কের দিকে তাকিয়ে বলল, কয়েকটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা বাদ দিলে বাড়িটা যে একটা ভাল হোটেল হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিনায়ক বলল, 'হ্যাঁ, ট্যাকের কড়ি খরচ করে সবই তো করলাম, এখন অদৃষ্ট।

—এত টাকা খরচ করে উদাসীন থাকলে তো চলবে না, অদৃষ্টের দোহাই দেওয়াও ঠিক নয় কথাটা বলল নলিন।

—যাক সবই তো হ'ল, এখন আমাদের তিনজনের কার কতটা অংশ হোটেলে থাকবে ঠিক করতে হবে।

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে খাট, টেবিল, চেয়ার আরো খুটিনাটি জিনিস দিয়ে ঘরগুলি সাজান হ'ল। সব শুদ্ধ বাইশটা বেড দেখা গেল। এ ভাবে কাজ শেষ করে দুপুরের আহারে চলে গেল সকলে।

•

এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল বিনায়ক কিন্তু পথে নামতেই সেই বিশ্রী গন্ধটা আবার অনুভব করল। আর তখনই তার মনে হল, দেহের ভেতরটা কি পচতে সুরু করেছে? দেহটা কি কোন কবর থেকে উঠে এল? মৃত্যু কি আমার পিছনে। দেখতে দেখতে এই সমস্ত চিন্তাতেই দিন কেটে গেল বিনায়কের। কিন্তু অন্তহীন দুর্গন্ধময় যন্ত্রণার কোন অবসান হ'ল না।

সন্ধ্যায় আবার বৃষ্টি নামল। বিরামহীন শীতল বাতাস সমুদ্রের দিক থেকে ছুটে আসছে। সে বাতাসের সুর এত মর্মস্পর্শী যে যে কোন মানুষের মনকে অস্থির করে তোলে। সেই অস্থিরতার মধ্যে নলিন আর বিনা ছায়ামূর্ত্তির মত হলঘরে এসে ঢুকল। এই হলঘরে চারটে বেড পাতা রয়েছে। তিনটা খাট নতুন, একটা বেড জ্যাকসন সাহেবের ব্যবহৃত। নতুন বিছানা থেকে সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছে কিন্তু অস্বস্তি লাগছে ইলেকট্রিক লাইট না থাকাতে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে মোমদানিতে মোম জ্বালল নলিন। একটু পরে কে যেন একটা লণ্ঠন রেখে গেল। দুটো আলোই প্রেতচক্ষুর মত জ্বলতে লাগল।

বিনায়ক বলল, মনটা ভাল নেই নলিন। বিশ্রী গন্ধটা কিছুতেই আমাকে নিষ্কৃতি দিচ্ছে না। আর সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানিস, ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখুজ্যে একটা অদ্ভুত কথা বলল। গন্ধটা নাকি মৃত মানুষের দেহের গন্ধের মত।

কথাটা শুনে বেশ আতংকিত ভাবেই তাকাল নলিন। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, ডাক্তারটা খুবই মুর্খ, এমন কথা কেউ বলে।

নলিনের কথাটা শুনে খুশি হ'ল বিনায়ক। মদের গ্লাসে কয়েক টুকরো বরফ রাখল, একটু পরে দুজনে দুটো গ্লাস তুলে নিয়ে আকণ্ঠ মদ্যপান করে আলো আঁধারী ঘরে দুটো খাটে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল তারা। দেখতে দেখতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ওরা। অবরুদ্ধ সাপের গর্জনের মত বিনায়কের নাসিকা গর্জন সুরু হল।

•

ঘণ্টা দুয়েক পর পাশ ফিরে শুতে গিয়েই বিনায়ক বুঝতে পারল তার খাটটা যেন কেউ নাড়াচ্ছে। বিনায়ক উঠে বসল আর তখনই নজরে পড়ল মৃত গাছটার কাছে কে যেন কি করছে। আস্তে আস্তে জানলার কাছে যেতেই মনে পড়ে গেল, নলিন ভজনের হাত থেকে একটা লোক মোহর কেড়ে নিয়েছিল। এ বেটা নিশ্চয়ই সেই চোর। লুকোন মোহরগুলি বুঝি নিয়ে পালাতে চাইছে। ভীষণ উত্তেজিত

হয়ে উঠল বিনায়ক। কোনদিকে না তাকিয়ে লোকটাকে ধরবার জন্য ছুটে নিচে নেমে গেল। বিনায়ককে আসতে দেখে লোকটিও খুব দ্রুত শ্মশানের দিকে ছুটতে লাগল। সমুদ্রতীরের কাছাকাছি এসে একটা ডিঙ্গি ভাসিয়ে দিল লোকটি।

বিনায়কও তড়িৎবেগে উঠে বসল ডিঙ্গিতে। লোকটি কিছু বলতে চাইল, কিন্তু বিনায়ক এত উত্তেজিত যে একটা কথাও বলতে পারল না। ও যেন বাকশক্তি হারিয়ে অদৃশ্য শক্তির অধীন হয়ে পড়েছে। আবিষ্ট মন দিয়ে বিনায়ক তাকাল লোকটির দিকে। কিন্তু মুখটা ভাল দেখতে পেল না।

অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রের বুকে ডিঙ্গিটা তখন তীর থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। এই অবস্থাতেই প্রচণ্ড শূন্যতা অনুভব করে বিনায়ক বুঝবার চেষ্টা করল, আমি কোথায়?

আপন মনেই বিনায়ক আবার বলল, ডিঙ্গিটা কি আমাকে অন্য জগতে নিয়ে যাচ্ছে?

সেই দুঃখময় জগতের কথা ভেবে উৎকণ্ঠা ভয় আর বিচিত্র অনুভূতিতে স্নায়ুগুলো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বিনায়কের। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত সেই লোকটির দিকে। ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে দাঁড়ের টানে টানে লোকটির পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। নীল চোখের তারায় একটা তেজস্কর জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। সেই জ্যোতিই যেন বিনায়কের সব কিছু অনুভূতি নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। খুব ধীরে ধীরে একটা তন্ময়তা দেখা দিল ওর মধ্যে। দিগন্ত বিস্তৃত নীল সমুদ্রের বুকে মোহাচ্ছন্ন হয়ে ভাবল, আমি কি অসীম অনন্তের পথে চলেছি?' হঠাৎ ডিঙ্গিটা বৃত্তাকারে পাক খেতে খেতে কাৎ হয়ে গেল। দমকা বাতাসে লোকটির দেহ থেকে বস্ত্রখণ্ড উড়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তের মেঘের বুকে পড়ল বিদ্যুতের চাবুক। চোখ ধাঁধান আলোয় লোকটির মুখ দেখে বুক কেঁপে উঠল বিনায়কের।

লোকটি বিকটভাবে হাসতে হাসতে হায়নার মত দাঁত দিয়ে নিজের দেহেরই খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে খেতে লাগল। তারপর সুতীক্ষ্ণ

নখ দিয়ে বাদামী কেশে আঁচড় টানতে টানতে ইচ্ছাকৃত ভাবেই ডিঙ্গিটা ডুবিয়ে দিল এবং অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে সমুদ্রের অতল তলে টেনে নিয়ে গেল বিনায়ককে।

বিনায়ক জ্ঞান হারাল। বহুক্ষণ পর যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখল বিশাল একটি হলঘরে কতকগুলো আদিম মানুষের মাঝে শুয়ে আছে সে। যে মানুষগুলোর কাছে শুয়ে আছে, তাদের দেহের লোম অত্যন্ত ঘন এবং দীর্ঘ। খুব সম্ভব করোটির পাত্রে রুধির পান করছে তারা। তাদের ক্রিয়াকলাপ দেখে আতংক, বিস্ময় আর অবসাদে কেঁদে ফেলল বিনায়ক। কান্না শুনে পদবিহীন একটা মোষ বুকে ভর দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কাঁপা কাঁপা গমগমে আওয়াজ তুলে কি যেন বলল, কিছু বুঝতে পারল না বিনায়ক। এ ধাঁধার রাজ্যে সবই যেন অদ্ভুত।

বিষাদ মৌন মায়াবী প্রাসাদটার সাথে মানুষের যেন কোন যোগ-সূত্র নেই। তবু ভাবতে লাগল কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। সুদীর্ঘ সময় ধরে যে প্রাণীগুলো রুধির পান করছিল, এখন বিনায়ককে দেখে তাদের মনে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে লাগল। একটি দানবাকৃতি প্রাণী উঠে এসে বিনায়কের প্রত্যেকটি অঙ্গ দেখতে লাগল। সুতীক্ষ্ণ নখ দিয়ে আঁচড় দিতে গিয়ে বিনায়কের দু-পাটি দাঁত দেখে ভয়ে কিচির কিচির শব্দ করে সরে দাঁড়াল।

বিনায়ক লক্ষ্য করল, ওই সব প্রাণীগুলোর দাঁত নেই এবং সেই কারণেই ওরা দাঁত দেখে এত ভয় পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করতে

করতে ওদের দিকে তেড়ে গেল বিনায়ক। প্রাণীগুলো বিনায়কের হাব-ভাব দেখে ভয়ে দেওয়ালে সেঁটে যেতে লাগল। এই সুযোগে ওদের ভয় দেখিয়ে পালিয়ে যাবার পথটা জেনে নিতে মনস্থ করল বিনায়ক, কিন্তু ফল হল উল্টো! বার কয়েক দাঁত খিঁচুনি খাওয়ার পর প্রাণীগুলো একসঙ্গে সন্নিবিষ্ট হয়ে ওকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর একসাথে তীক্ষ্ণ নখে ওকে ক্ষত বিক্ষত করতে লাগল। ভয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল বিনায়ক। ওর চিৎকারের শব্দে সেই দানবাকৃতি জীবন্ত মানুষটা ছুটে এসে ঘাড় ধরে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেল বিনায়ককে। শয়তানটার অমানুষিক ব্যবহারে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে লাগল বিনায়কের অন্তরে। পৃথিবীর মাটিতে পেলে ওকে শেষ করে দিত কিন্তু এখন কোন উপায় নেই। হঠাৎ একটা আলো দেখে বিস্মিত হল। পরক্ষণেই বুঝল এত আলো নয়, এ যেন জ্বলন্ত চোখ!

বিনায়ক বলল, 'কে তুমি? অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?'
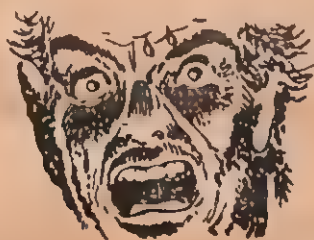
কথা শেষ হতেই বজ্রকণ্ঠে বলাই কুণ্ডুর প্রেতাত্মা বলে উঠল, আমি কে? আমাকে চিনতে পাচ্ছিস না মূর্খ। এত তাড়াতাড়ি বলাই কুণ্ডুকে ভুলে গেলি?

—এ কি? বলাই কাকা আপনি এখানে?

নরকের অন্ধকারে বলাই কুণ্ডুর বীভৎস রূপ দেখে বিনায়কের সমস্ত অনুভূতি অসাড় হয়ে যেতে লাগল।

বলাই কুণ্ডুর প্রেতাত্মা, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আমার টাকা ?

টাকার কথায় হতবুদ্ধি হয়ে বিনায়ক বলল, টাকা ! কিসের টাকা ? ও টাকা আমি দোব না। কোন সাক্ষী আছে আপনার ?

—আছে। তবে তার আগে কয়েকটা কথা বলে নি। টাকা যদি তুমি বাদল মুখুজ্যেকে না দাও, তাহলে আমার মত এই নরকের অন্ধকারে তোমাকে পচে মরতে হবে। আমার ও মুক্তি নেই। চুরি করলে এই ফল ভোগ করতে হবে।

—আর যে চোরের টাকা আত্মসাৎ করে ?

—তার ফল তো তোমার দেহেই সুরু হয়েছে। যতদিন বাঁচবে পচা মড়ার গন্ধ তোমার দেহ থেকেই অনুভব করবে। যা এখন করছ।

এই মুহূর্তে আবার এক ঝলক পচা গন্ধ অনুভব করল বিনায়ক।

বলাই কুণ্ডু আবার বলল, আমি তোমাকে এখানে আনিয়েছি। তুমি যখন টাকা আত্মসাৎ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তখন আমার কষ্ট দেখে এক সাহেবের প্রেতাত্মা সাহায্য করতে এগিয়ে এল। সেই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

—সাহেব কি আপনার পরিচিত ?

—না। তবে আমরা একই জায়গা থেকে এসেছি।

—সাহেবের কি অপরাধ ?

সে নারী হত্যাকারী। নাম মিঃ জ্যাকসন। তুমি এখন তার বাড়িই কিনেছ।

কথা বলতে বলতে বলাই কুণ্ডুর দেহ থেকে এক ধরনের আঁঠাল জিনিস বেরিয়ে আসতে লাগল। আর সেই পদবিহীন মোষটা বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে এসে কলাপাতার মত জিভ দিয়ে বলাইয়ের গা চেটে চেটে সেই আঁঠাল রসটা খেতে লাগল ব্যাপারটা এত অদ্ভুত আর বিস্ময়কর যে বিনায়ক দৃশ্যটা দেখে বোবা হয়ে গেল।

বলাই কুণ্ডুর প্রেতাত্মা আবার বলল, আমার কথাগুলো ভাল করে শুনে রাখ। এগুলো পালন করলে ভাল হবে। আর যদি না কর, তা

হলে আবার সাত দিনের মধ্যে তোমাকে এখানে নিয়ে আসব।

—বলুন, কি কথা আপনার?

যে বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়েছিলি ওটা আমার বালিশ। ওতে দু'শ টাকা আছে। ওই টাকায় গয়ায় গিয়ে আমার নামে পিণ্ড দিয়ে আসবে।

— ও বালিশ আপনার কি করে হ'ল? ও তো আমি শয্যাভবন থেকে কিনেছি।

—হ্যাঁ, শ্মশান থেকে নিয়ে গিয়ে নন্দডোমই ওখানে বেচে দিয়ে এসে ছিল। আমার দ্বিতীয় কথা ও বাড়িতে তুমি হোটেল কর না। মোহরের লোভে কোন প্রেতাত্মাকে বিরক্ত কর না। সাহেব ভূত তোমার উপর ভীষণ রেগে আছে। তৃতীয় কথা আমার গচ্ছিত টাকা বাদল মুখুজ্যেকে অবশ্যই দিয়ে দেবে।

—আপনার সব কথা পালন করব, একমাত্র ওই টাকার কথা বাদে। কারণ বর্তমান সমাজের নীতিই হচ্ছে উৎকোচগ্রহণ, চুরি, গুণ্ডামি, খুন, রাহাজানি, নারীর শ্লীলতাহানি ইত্যাদি। কাজেই সেই সমাজে বাস করে আমি যদি টাকা ফেরৎ দিতে যাই, সরকারের কাছে আমিই দোষী হয়ে পড়ব। থানার লোক তখন আমাকে অস্থানে কুস্থানে নিয়ে টানাটানি করবে। শেষে ও টাকা ওদের পেটেই যাবে। তবে যদি কোন পার্টির ফাণ্ডে দিতে বলেন দিয়ে দোব।

পার্টি! তোমাদের ওখানে এখন শুধু ব্যাঙপার্টি ছাড়া আর কোন পার্টি নেই। বাদলকে টাকা ফেরৎ না দিলে আমার নরক বাস আরও বেড়ে যাবে।

—আমি টাকা দোব না।

তবে রে। বলেই বলাই কুণ্ডুর প্রেতাত্মা তীব্র নিশ্বাস ছেড়ে অব্যক্ত অবর্ণনীয় ভয়ংকর এক দৃশ্যের অবতারণা করল। একটা ধূম্রজাল সৃষ্টি হল সারা ঘরে, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল নারী। নারীর নিম্নাঙ্গে জেলি ফিসের আস্তরণ, ঊর্ধাংগ কৃষ্ণকেশে আচ্ছাদিত। তার অগ্নিক্ষরা কুটিল দৃষ্টিতে প্রচণ্ড ঘৃণা আর হিংসার ভাব প্রকাশ

পাচ্ছে। এই নারীকে চিনতে পারল বিনায়ক। পাড়ার এক মস্তান একদিন সমুদ্রের ধারে এ মেয়েটিকে একা পেয়ে সব কিছু শেষ করে দিয়ে ছিল। লজ্জায় ঘৃণায় সে রাতেই আত্মহত্যা করেছিল মেয়েটি। এই মেয়েটির নাম সুন্দরী। বলাই কুণ্ডু টাকা রাখার সময় ও সাক্ষী ছিল।

মেয়েটির ভয়ংকর রূপ দেখে ভয়ে ভয়ে বিনায়ক বলল, সুন্দরী তুমি না?

—হ্যাঁ। কুণ্ডুমশাইয়ের টাকা ফেরৎ দিচ্ছ না কেন?

—আমি কারও টাকা নিই নি।

—এত বড় মিথ্যা কথা! কথাটা শেষ করেই গর্‌গর্‌ শব্দ করে মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়ল বিনায়কের ওপর। তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে কণ্ঠনালি ছিঁড়ে ফেলতে চাইল তার। দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি সুরু হ'ল।

ক্ষণিকের মধ্যে বিনায়ককে চিৎ করে বুকের উপর চেপে বসল পিশাচটি। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য বিনায়কও মেয়েটির কেশগুচ্ছ ঘোড়ার লাগামের মত দু হাতে টেনে ধরেছে।

সুন্দরী শেষবারের মত বলল, এখনও বল, টাকা ফেরৎ দেবে কি না? না হলে শেষ করে দেব।

পিশাচটির নখের চাপে শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল বিনায়কের। এখন আর স্বীকার না করে উপায় নেই।

বিনায়ক বলল টাকা ফেরৎ দোব। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।

কথাটা মনে থাকে যেন। বলেই সুন্দরী পিশাচটি বিনায়কের পা দুটো ধরে ঘূর্ণায়মান চক্রের মত মাথার উপর দিয়ে বার কয়েক ঘুরিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ধপাস্‌ করে একটা শব্দ হতেই নলিনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আশ্চর্যভাবে দেখল লণ্ঠনটা টেবিল থেকে পড়ে গিয়ে দপ্‌ দপ্‌ করছে আলোটা। আর বিনায়ক মেঝেতে পড়ে কাৎরাচ্ছে। সারা ঘরে ভাঙ্গা কাচের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। বিনায়ককে তাড়াতাড়ি খাটে তুলল নলিন। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ পর কাঁপা কাঁপা গলায়

বিনায়ক কথা বলল, নলিন এ আমি কি দেখলাম? কোথায় ছিলাম!

বিনায়কের কথায় ভীষণ বিরক্ত হ'ল নলিন। বলল, কেন অত মদ খাস।

নিস্তেজ ভাবে বিনায়ক বলল, তুই কি আমার কথা বিশ্বাস করবি?

ঠিক সেই মুহূর্তেই নলিন লক্ষ্য করল বিনায়কের হাতের মুঠোয় এক গুচ্ছ কেশ। সুদীর্ঘ কেশ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল নলিন।

আমি এর রহস্যটাই তোকে বলব। বলেই সমস্ত ঘটনাটা নলিনকে শোনাল বিনায়ক। এই ঘটনা শুনতে শুনতে যদিও নলিনের শরীর মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল, তবুও বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু ভীষণ উৎকণ্ঠার মধ্যেও বিনায়ক অবিশ্বাস্য ঘটনাটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলল বলাই কুণ্ডুর সেই বালিশ ছিঁড়ে দু'শ টাকা বার করে। নলিন নির্বাক হয়ে দেখল, ছায়া ছায়া অন্ধকারে সাদা তুলোগুলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। বালিশ থেকে বেরুল দশ টাকার কুড়িখানা নোট। সে রাতটা জেগেই কাটাল ওরা।

পরের দিন বিনায়ক বাদল মুখুজ্যেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বলাই কুণ্ডুর ব্যাপারটা বলল। এ ভাবে চুরি যাওয়া টাকা ফেরৎ পেয়ে ভীষণ আশ্চর্য হ'ল বাদল। একদিন বলাই কুণ্ডুকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুশোচনাও হ'ল। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা—টাকা দেওয়ার সাথে সাথেই বিশ্রী গন্ধটাও বিনায়কের দেহ থেকে উবে গেল। এই যে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল এর বৈজ্ঞানিক কোন যুক্তি আছে কি?

বলাই কুণ্ডুর প্রেতাত্মা বিনায়কের সব উদ্যম নষ্ট করে দিয়েছে। সেই রাতের দৃশ্যটা মনে পড়লে তার বুক কেঁপে উঠে। সত্যি, ভয় আর আতংক কাকে বলে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে বিনায়ক।

এইভাবেই আরো কয়েকটা দিন কেটে গেল। এখন সব চিন্তা বিসর্জন দিয়ে বিনায়ক শুধু একটা কথাই চিন্তা করছে, বাড়িটার সম্বন্ধে কি করা যায়। বিশেষ করে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে গেছে তাতে হোটেল

করার কথা ভাবাই যায় না। নলিন বা ভজন যদি কিছু করে, তা হলে হয়ত কিছু টাকা ফেরৎ পেতে পারি।

মাথার ওপর দিয়ে ঘন কালো মেঘ উড়ে যাচ্ছে। সূর্য ডুবু ডুবু। সমুদ্রের বালুতটে দাঁড়িয়ে আপন মনেই বলে উঠল বিনায়ক, যতদিন বাড়িটা আমার হাতে থাকবে ততদিন নিরাপদ নেই। পরক্ষণেই ভাবল আমি কি নির্বোধ। দিন রাত শুধু বাড়ির কথাই চিন্তা করছি। টাকাটা তো জলে ফেলে দিই নি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বাড়ি পাহারা দেওয়ার ব্যাপারে। রাতে কেউ পাহারা দিতে চায় না অথচ বহু টাকার জিনিস ওখানে পড়ে আছে। চুরি হলে কিছু করবার নেই। ভজনকে একবার বলে দেখা যেতে পারে। ও তো তন্ত্র-মন্ত্র তুক-তাক একটু আধটু জানে, সাধারণের থেকে ভূতের ভয়টাও একটু কম। এখন রাত নটা। বিনায়ক সমুদ্রতীর থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল একটা নির্জন জায়গার দিকে। সে জানে এ সময় ভজন কোথায় থাকে। সেই নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল বিনায়ক। ডাকল ভজনের নাম ধরে। ওর গলার আওয়াজে কয়েকজন সমাজবিরোধীর হাতের তাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

বিনায়ক বলল, ভজন আছে?

মস্তান রঙ্গনাথ উত্তর দিল, আছে। ডেকে দোব?

হ্যাঁ।

একটু পরেই মাটির ভাঁড়ে মাংস আর বোতল হাতে বেরিয়ে এল ভজন। কি ব্যাপার? এ অসময় তুই এখানে?

তোর সাথে কথা আছে।

চল। বলেই জুয়াড়ীদের সতর্ক করে দিয়ে অন্ধকার গলিপথ থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। তারপর গিয়ে বসল সমুদ্র তীরের কাছাকাছি। বিনায়কই বলল, আচ্ছা ভজন, ভূতপ্রেত সম্বন্ধে তোর ধারণা কি? ওরা কি সত্যি মানুষের ক্ষতি করতে পারে?

পারে। তবে এ সময় ও সব বিষয়ে তোর সাথে আলোচনা করব

না। অন্য কিছু বলার থাকলে বল।

বলছিলাম বাড়িটায় তোরা দুজনে মিলে একটা হোটেল কর না।

হোটেল করার মত অর্থ, আমার বা নলিনের কাছে নেই, বেশ দৃঢ় স্বরে কথাটা বলল ভজন।

ওরা যখন দুজনে কথা বলছে ঠিক তখনই লক্ষ্য করল, কোট প্যান্ট পরা একটি লোক সী-বীচ দিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। গাঢ় অন্ধকারে নির্জন বালুতটে হঠাৎ যে নলিনকে এ সময়ে দেখতে পাবে ভাবতে পারে নি।

কি ব্যাপার? কোথায় গেছলি নলিন? কথাটা বলল বিনায়ক।

নলিন সহজভাবেই উত্তর দিল, মিষ্টার দত্তের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। আজ তার মেয়ের জন্মদিন।

কথাটা শুনে খুব আশ্চর্য হ'ল বিনায়ক। বলল, দত্ত। কোন্ দত্তের কথা বলছিস?

ভজন উত্তর দিল নলিনের হয়ে—আরে সেই রসিক দত্ত। অমর মুখুজ্যের বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। ভদ্রলোক ছুটি কাটাতে এখানে এসেছেন।

নলিনের মনটা খুবই পুলকিত মনে হচ্ছে। পোষাক থেকে ভুর ভুর করে সেন্টের গন্ধ আর কথার মধ্যে রহস্যের ভাব।

বিনায়ক বলল, শুধু নিমন্ত্রণ। না, আরও কিছু আছে ভাই নলিন। এই জন্যেই কদিন তোমার পাত্তা নেই। কথাটা বলেই ঈষৎ হাসল বিনায়ক।

ভজন বলল, নলিন এখন অন্য জগতে।

—কি বাজে কথা বকছিস? নে সিগারেট ধরা। বলেই পকেট থেকে দামী সিগারেট বার করল নলিন।

তিনজনেই সিগারেট ধরাল।

—চমৎকার, এ মাল কোথায় পেলি? নিশ্চয়ই দত্ত সাহেবের ওখানে? ভজন বলল কথাটা।

নলিন হাসল। বলল, ঠিক ধরেছিস। রুবীই দিল। কথা বলতে

বলতে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল তিনজনেই। কিছুক্ষণ পর ভজনই বলল, কথাটা হচ্ছে আমাদের টাকা থাকলে হোটেল খুলতাম। নলিন কিন্তু চেষ্টা করলে টাকা যোগাড় করতে পারে।

—আমি টাকা জোগাড় করব? কে দেবে আমাকে?

কেন শুনেছি দত্ত সাহেবের অনেক টাকা।

আমাকে বিশ্বাস করে উনি অতো টাকা ইনভেস্টমেন্ট করবেন কেন?

দেখ না চেষ্টা করে। দত্ত তোর মামার বন্ধু, না হয় মামার সাহায্যে কথা বলে দেখবি।

ভজনের কথার মাঝে বিনায়ক বলল, নলিন এখন দত্ত কোম্পানির অন্দরের একজন; সে মামার সাহায্যে টাকার কথা বলবে কেন? সরাসরি বলবে, তাও যদি না পারে, ত' হলে দত্তকেই বলুক না একটা হোটেল খুলতে তাতে তো ভবিষ্যতে তোরই লাভ।

সব কথা মন দিয়ে শুনল নলিন। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করল না! ভাবল কথাটা বিনা মন্দ বলে নি। মিঃ দত্তকে বাড়িটা নিতে রাজি করাতে পারলে ভবিষ্যতে আমার হতেও পারে। এ ভাবেই সে একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিল। কালই মিঃ দত্তকে কথাটা বলব।

কি রে, কিছু ভাবলি? ভজন বললে কথাটা।

দেখব, কতটা কি করতে পারি। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছল নলিন। রাত অনেক হয়ে গেল। উঠে দাঁড়াল ওরা। তারপর রাত্রির স্তব্ধতার পশ্চাৎপটে আত্মার গুঞ্জন চাপা রেখে, সমুদ্রের দিকে তাকাল কিন্তু সে দৃষ্টিতে প্রাণের স্পন্দন নেই। সিগারেটের ক্ষীণ আলো ঠোঁটের কোণে কেবলমাত্র জোনাকীর মত তখনও জ্বলছে।

নলিন ভজন সারা রাত ঘুমোতে পারল না। নানা চিন্তা মাথায় জট পাকাচ্ছে। ভজন ভাবছে মিঃ দত্ত বাড়ি নিলে ওর কোন লাভ নেই। আমি যদি কাউকে পেতাম যে আমাকে বা আমার হয়ে বাড়িটা নিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে রকম কোন লোকের

কথা মনে পড়ল না ভজনের। অগত্যা নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করে খুবই ম্রিয়মান হয়ে পড়ল সে।

শৈশব থেকে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে যে ক্ষুধার অন্ন জোগাড় করছে, তাকে কেই বা সাহায্য করবে? যার আছে তাকেই তো লোকে দেয়। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল ভজন। আর নলিন? সে কল্পনার জাল বুনে অনেক কিছুই স্বপ্ন দেখল। হয়ত এ স্বপ্ন সফল হবে না, তবু স্বপ্নকেই তো মানুষ বেশি ভালবাসে। জীবনে যা পাওয়া যায় বা যায় না স্বপ্নে ও দুটোর স্বাদই মিটে। তাই মানুষ এ তো স্বপ্নপ্রবণ কাজেই নলিনের আর দোষ কি।

খুব ভোরেই স্বপ্নের ঘূর্ণাবর্ত থেকে জেগে উঠল নলিন। এক ঘন্টার মধ্যে তৈরি হয়ে এসে হাজির হ'ল মিঃ দত্তের আবাসে। চায়ের টেবিলেই ভূত-কুঠির কথাটা তুলল এবং কথার উপর রং চড়িয়ে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করল, যাতে মিঃ দত্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে বাধ্য হলেন, স্ত্রী এবং মেয়ের মত থাকলে বাড়িটায় হোটেল খোলার ব্যবসা করতে পারেন।

নলিন দেখল তার চারে মিঃ দত্ত যখন এসেছেন তখন যে ভাবেই হোকবাড়িটা নেওয়াবই।

আমি তো মনে করি বাড়িটাই আপনাকে শেষ জীবনে শান্তি এনে দেবে। আর লাভ, ওটা তো আপনার নিজের কাছে। কথাটা বলেই রুবীর দিকে তাকাল নলিন।

মিসেস দত্ত বললেন, নলিনের কথায় যুক্তি আছে। ক'মাস পরেই তো রিটায়ার করবে। হোটেল থাকলে ভালোই হবে।

কিন্তু বাড়িটা তো ভূতের বাড়ি। তোমরা কি থাকতে পারবে? কথাটা বলেই স্ত্রীর দিকে তাকালেন মিঃ দত্ত।

রুবী বলল, তুমিও তা হলে ভূত বিশ্বাস কর বাবা?

না, তা ঠিক নয়, তবে···। যাক গে, বাড়ি পছন্দ হলে হোটেল খুলব। চল, বাড়িটা বরং একবার দেখেই আসি। মিঃ দত্তকে উঠতে দেখে ভীষণ খুশি হল রুবী। বলল, পুরীতে আমাদের হোটেল হবে

ভাবতে ভীষণ ভাল লাগছে।

হাঁটতে হাঁটতে সেই বিরাট বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। মিঃ দত্ত দেখলেন জরাজীর্ণ বাড়িটার বুকে রং সিমেণ্টের প্রলেপ পড়েছে। জানলা দরজাগুলো সেকালের রুচি অনুযায়ী হলেও হোটেলের পক্ষে খুবই মানান সই।

ঘরগুলো সুন্দর এবং দৈর্ঘ প্রস্থে বেশ বড়। তা ছাড়া নিচের দক্ষিণ দিকটায় নিজেরা থাকলেও বাকি ঘরগুলোতে অন্ততঃ পঁচিশ জন থাকতে পারবে। নলিন ছেলেটিও বেশ রুচিবান ভদ্র। যদি ও কিছুটা দায়িত্ব নেয়, তা হলে হোটেল চালানটা কোন সমস্যাই নয়। অতএব বাড়িটা নেওয়াই মনস্থ করলেন মিঃ দত্ত। তারপর নলিনকে নিয়ে চলে এলেন বিনায়কের বাড়িতে।

গুড়াকু দিয়ে দাঁত মাজছে বিনায়ক। আজ উঠতে দেরি হয়ে গেছে। কয়েক দিনের সেই অমানুবিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে খুব ঘুমিয়েছে। ওদের আসতে দেখে ভেতরে গেল বিনায়ক। কারণ চিরদিনের অভ্যাস গামছা পরে দাঁড়িয়েছিল। এ অবস্থায় কোন ভদ্রলোকের সামনে আসা যায় না। পোশাক বদলে বিনায়ক এসে বসল ওদের কাছে। একটা ছেলে তিন কাপ চা দিয়ে গেল। নলিন হাতে হাতে কাপগুলো এগিয়ে দিল। তারপর বিনায়কের দিকে তাকিয়ে বলল, মামাবাবুর সাথে কথা বল। ওঁর ইচ্ছে আছে হোটেল করার। বাড়ি পছন্দ হয়েছে।

কি যেন ভাবল বিনায়ক। বলল, তুই-ই ঠিক কর না।

মিঃ দত্ত বললেন, বাড়িটা দিয়ে দিচ্ছেন কেন? নিজেও তো কিছু একটা করতে পারেন—

নলিন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ও তো এখানে বেশি থাকে না। কোণারকে ওদের জমি জমা আছে, সে সব নিয়েই ও সব সময় ব্যস্ত থাকে। কাজেই ওর পক্ষে হোটেল করা সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, তা তো বটেই। বলেই চুরুটের মুখে আগুন দিলেন মিঃ দত্ত। বলুন, কি ভাবে বাড়িটা দিতে চান?

নলিনের দিকে তাকাল বিনায়ক, কারণ মিঃ দত্তকে ও কি বলে নিয়ে এসেছে জানা নেই। কথাটা দু-রকম হয়ে গেলে পার্টি হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে।

তোর মুখ থেকেই মামাবাবু সব কিছু শুনতে চান। নলিন বলল কথাটা।

নলিনের কথার উত্তরে বিনায়ক বলল, ভাড়া লীজ অথবা কিনতে—কোনটা চান মামাবাবু?

ধরুন ভাড়াই।

ছ'শ করে দিলেই চলবে মাসে।

কিন্তু বাড়িতে তো ইলেকট্রিক নেই?

ওটা মাস তিনেকের মধ্যে হয়ে যাবে আশা করি।

নলিন বলল, গরমের ছুটির আগে হলেই হ'ল।

মিঃ দত্ত আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, ঠিক আছে আপনার কথাও থাক, আমার কথাও থাক মাসে পাঁচশ' করে পাবেন। তাতে যদি রাজি থাকেন লিখিত পড়িত ব্যবস্থা করে কাজটা এখনই সেরে ফেলতে পারেন।

মিঃ দত্তের কথা শুনে বিস্মিত হ'ল বিনায়ক। এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিল, ভদ্রলোকের মনে কোন অভিসন্ধি নেই তো?

নলিন বলল, মামার কথাটা রাখ বিনা—

বিনায়ক বলল, আমি একটু ভেতর থেকে আসছি। বলেই উঠে গেল বিনায়ক। বাবার সাথে পরামর্শ করে ফিরে এসে বলল, একটু বসুন, বাবা আসছেন।

আধঘণ্টার মধ্যেই ব্যারিস্টার মিঃ মিত্র শর্তের কাগজপত্তর নিয়ে এসে বললেন, এর কোন দরকার ছিল না। যাক গে, মিঃ দত্ত, দেখুন আর কিছু লেখার প্রয়োজন আছে কিনা—

মিঃ দত্ত কাগজখানা হাতে নিয়ে দেখলেন প্রতিটি ছত্রে ছত্রে শুধু আইনের প্যাঁচ। ওটা অবশ্য নিয়ম। যে ব্যারিস্টার যত প্যাঁচ কষতে পারবে, তার তত দাম।

ঠিক আছে। বলেই সই করে বিনায়কের দিকে কাগজখানা এগিয়ে দিলেন মিঃ দত্ত। আমি টাকাটা নলিনের হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর কাল থেকে আমরা এখানে চলে আসছি।

ব্যারিস্টার মিঃ মিত্র সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ করে মিঃ দত্তকে বললেন, একদিন যাব আপনার হোটেলে।

নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। সে কি কথা, আপনাদের জন্যেই তো— হোটেলটা করতে পারব। চলি, নমস্কার।

নলিন আর দত্ত চলে যেতেই বাপ আর ছেলের চোখে চোখে যেন কথা হয়ে গেল। মিঃ দত্তের বোকামির কথা ভেবে হেসে উঠল দুজনেই।

পরের দিনই মিঃ দত্ত ট্র্যাংক বিছানা টুকিটাকি জিনিসপত্তর নিয়ে উঠলেন ভূত-কুঠিতে। মিসেস দত্ত আর রুবী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিজেদের ঘরগুলি গুছিয়ে ফেললেন। তারপর মাস খানেকের মধ্যেই নলিন ভজন বিনায়কের সাহায্যে হোটেল খোলার ব্যবস্থা করলেন মিঃ দত্ত।

আপাততঃ চারজন লোক রাখা হয়েছে। ঠাকুর চাকর ঝি এবং স্টেশন থেকে যাত্রী ধরে আনার জন্য একজন তুখোড় ছোকরাকে।

বিনায়ক যাচ্ছিল পথ দিয়ে ডাকলেন মিঃ দত্ত। এসে দাঁড়াল বিনায়ক। কি ব্যাপার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

মিঃ দত্ত বললেন, না না, একটা সমস্যায় পড়েছি তাই ডাকলুম। কর্মচারিদের থাকার জন্য খানকয়েক ঘর তুলতে হবে। আপনার পারমিসান ছাড়া তো সেটা হবে না।

বিনায়ক মন দিয়ে মিঃ দত্তের কথা শুনে বলল, চলুন, পিছনের আউট হাউসটায় যাওয়া যাক।

দুজনে গিয়ে দাঁড়াল কুঠিরের পেছনে। মিঃ দত্ত চিন্তা করে দেখলেন বালির স্তূপ সরাতে পারলে দুটো ঘর হয়ে যেতে পারে।

বিনায়ক বলল, তাহলে কাল থেকেই লোক লাগাব, আপনার সমস্যা মিটে যাবে।

বিনায়ক চলে যেতেই মিঃ দত্ত হিসেবের খাতা নিয়ে বসলেন।

আর রুবী সমুদ্রের জোয়ারের মত পাখনা মেলে সারা বাড়িটাকে আনন্দে মাতিয়ে তুলল। নাচ, গান, হৈ হুল্লোড়, বাবা ও মার ওপর মাতব্বরী ঠাকুর চাকরদের দিকে নজর রাখা, এখন ওর বড় কাজ। রুবীর সবচেয়ে বড় গুণ হল, যে কোন মানুষকে আপন করে নিতে পারে। তারই সূত্র ধরে নলিন, ভজন, বিনায়কের মিঃ দত্তের বাড়িতে যাওয়া আসাটা বেড়ে গেছে। ওরা তিনজনেই দত্তের সংসারে জামাই আদর আশা করে। কিন্তু সবচেয়ে সমস্যা হয় যখন তিনজনেই একসাথে এসে পড়ে। ওরা একা একাই রুবীর কাছে আসতে চায়, কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে যায়। ফলে একে অন্যকে দেখে গম্ভীর হয়ে যায়। তা দেখে রুবী খিল খিলিয়ে হেসে বলে, এত গম্ভীর হয়ে গেলেন যে সব?

ভজন বলে, না বাড়িতে একটা কাজ আছে।

ও মা, সে কি কথা। কাজ ফেলে আড্ডা দেওয়া এসব আমি মোটেই পছন্দ করি না।

ভজন মনে মনে বিরক্ত হয় রুবার কথা শুনে। ভাবে মেয়েটা বোঝে কম। যাক গে, এখন যাওয়াই ভাল। হাই তুলতে তুলতে ভজন চলে গেল।

রুবী বিনায়ককে বলল, আপনি হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন যে বিনায়কবাবু।

রাতে ভাল ঘুম হয় নি, শরীরটা ভাল লাগছে না। কথা শুনে রুবী ছুটে এসে গায়ে মাথায় হাত দিয়ে বলল, সর্বনাশ, এ তো জ্বর নিয়ে কেউ বাড়ি থেকে বেরোয়? রুবী চিৎকার করে ডাকল দিবাকর ঠাকুরকে, এদিকে এস বিনায়কবাবুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েএস।

বিনায়ক বলল, আমি একাই যেতে পারব। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নলিনের দিকে তাকিয়ে চলে গেল বিনায়ক। ও চলে যেতেই হেসে উঠল রুবী। বলল, ভদ্রলোকের গা বরফের থেকেও ঠাণ্ডা। তা আপনার

অবস্থা কি রকম নলিনবাবু? কথা বলেই বাঁকা চোখে নলিনের দিকে তাকাল রুবী।

মুচকি হাসল নলিন। আমার অবস্থা আপনারই মতন।

তার মানে!

মানেটা বুঝলেন না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার দেখুন তো—বলল নলিন।

চা আনার ছুতো করে রুবী গিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে। দেখল যৌবন তরঙ্গে রূপের বুদবুদ। শরীরের খাঁজে খাঁজে আগুনের সোনালী আভা যেন ওকেই দগ্ধ করছে। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অমন করে কি দেখছিস? মার ডাকে লজ্জা পেল রুবী। বলল, কই, কিছু না তো।

আমি জানি। মায়ের মন সব বুঝতে পারে। সুজনের কথা ভাবছিস? যে যায়, সে আর আসে না রে। সব ভুলে যায়।

ও সব কথা থাক মা। চা-টা দাও, নলিনবাবু অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন।

একা একা বসে থেকে বিরক্ত হ'ল নলিন। বুঝল এদের আন্তরিকতাটুকুও মেকী। মেয়েটাও যেন রহস্যময়ী। ধ্যূৎ, হ্যাংলার মত কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়—

রুবী ঘরে ঢুকে দেখল নলিন চলে গেছে। আপন মনেই সে বলল, আচ্ছা অসভ্য তো। না বলে চলে গেল। যাক গে, আবার আসবে।

বাড়ি ভাড়া নেওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত নলিন ভজন বিনায়কের সাথে রুবীর ঘনিষ্ঠতা ওই পর্যন্তই। সকলের মনেই একটা সংশয় দ্বিধা।

ডিসেম্বরের মাসের এক সকালে দেখা গেল, সেই ভূতুড়ে বাড়ির মাথার উপর ঝুলছে একটা বিরাট সাইন বোর্ড। 'হোটেল ডিসেন্ট'।

একটা সাজগোজ বর। কারণ আজই শুভ সন্ধ্যায় শহরের গণ্যমান্য-ব্যক্তি এবং প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মিঃ দত্ত।

দিন গেল। সন্ধ্যা হয়ে রাত নামল। বহু যুগ পরে ঘুম ভাঙল বাড়িটার। অন্ধকার প্রকোষ্ঠগুলোয় গ্যাস-বাতির আলোক তরঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠল। একে একে এল নিমন্ত্রিত অতিথিরা। ওদের মধ্যে কে একজন বলে উঠল, বাঃ, হোটেলের নামটা তো বেশ! নামটা নিশ্চয়ই নলিনের দেওয়া।

রুবী বলল, না ওটা ভজনবাবুর দেওয়া নাম। ওই তো ওঁরা আসছেন।

নলিন ভজন বিনায়ককে দেখে একটু ন্যাকা ন্যাকা ভাবে এগিয়ে গেল রুবী। বলল, এতো দেরি হ'ল যে? ভীষণ চিন্তা করছিলাম।

ভজন বলল, বাস্তব জগতে একে অন্যের কথা তখনই চিন্তা করে, যখন সে ভাবে পৃথিবীতে আমি একা।

নলিন বলল, আসলে আমরা কিন্তু এখনও একাই।

কথার নাটক যখন জমছে তখনই মিঃ দত্ত এসে সব পণ্ড করে দিলেন। সকলের মনের ভাব কেমন যেন সংকুচিত হয়ে গেল।

মা রুবী—তুমি এঁদের ওপরে নিয়ে যাও। কথা বলেই মিঃ দত্ত চলে গেলেন। আর তখনই এসে উপস্থিত হ'ল ক্যামেরাম্যান বাবলু গুহ। বাবলুর ডাকে ঘুরে দাঁড়াল রুবী। তার কণ্ঠস্বরে রোমাঞ্চিত হ'ল রুবীর দেহ মন। নীরবে হাসতেই নদীর স্রোতের মত আঁকাবাঁকা টোল পড়ল তার নরম গালে।

বাবলু বলল, প্লিজ মিস দত্ত একটু বাঁদিকে হেলে দাঁড়ান—তাকান আমার দিকে। ক্লিক ক্লিক করে বার তিনেক ফ্লাশলাইট জ্বলে উঠল ক্যামেরায়। এ ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করল ওরা তিন বন্ধু। মনে মনে বিনায়ক বলল, ছবিই যদি তুলবি আমাদের বাদ দিয়ে কেন? বাবলুর দিকে তাকাল বিনায়ক। তখনই রুবী আর বাবলু ওদের আসছি বলে ওপরে উঠে গেল।

ভজন বলল, বাবলুর আস্পর্ধাটা দেখলি তো বিনা?

বিনায়ক বলল, কাল সকালে ওর স্টুডিওটা ভেংগে দোব।

নলিন বলল, সে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আজই ভেংগে দিয়ে আয়।

বিনায়ক রেগে গেল। তোর জন্যই তো মেয়েটার কাছে প্রেসটিজ নষ্ট হ'ল। কি দরকার ছিল অত কথা বলার!

ভজন বলল, যাক গে, কাল দেখা যাবে। চ ওপরে।

হলঘরে অনেক লোক বসে আছে। বাবলু বলল, বাড়িটাকে আজ দেখে মনেই হয় না ভূতের বাড়ি।

ঠিক, ঠিক. একদম খাঁটি কথা। বলতে বলতেই এসে ঢুকল মানস ব্যানার্জী। মানস ট্যুরিস্ট গাইড—কাজেই যে দিকে যায় সঙ্গে কিছু বিদেশী থাকেই। এখানেও জনা দশেক বিদেশী পুরুষ মহিলা এসে উপস্থিত। এই নতুন হোটেলে যাতে ওরা থাকে তার জন্যই এত খাতির।

লোকগুলো থাকলে মানস শতকরা দশ টাকা করে কমিশন পাবে হোটেল মালিকের কাছ থেকে।

ভরত সাহা এক কোণায় বসে ছিল। সেই বোধহয় ইশারায় কিছু বলল মানসকে।

আর তখনই মানস বলে উঠল আমরা আজ এই শুভদিনে মিস রুবী দেবীর গান শুনতে চাই। সকলে খুশিতে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল।

অগত্যা রুবীকে গাইতে হল কয়েকটি গান। সত্যি অপূর্ব গাইল রুবী। লোকনাথ চাটুজ্যে বন্ধু অমর মুখুজ্যেকে ফিস ফিস করে বলল, সেই পান্না ভট্চাজের পর এত ভাল শ্যামা সংগীত কখনও শুনি নি।

অমর মুখুজ্যে গম্ভীর হয়ে বলল, বোকা কোথাকার। রবীন্দ্র সংগীতকে শ্যামা সংগীত বলছিস কেন?

বিনায়কের ভাল লাগছিল না এ পরিবেশ। কারণ রুবী

ওদের থেকে কমবয়েসী ছোকরাগুলোকে যেন বেশি আস্কারা দিচ্ছে।

বিনায়ক বলল, নলিন চল চলে যাই এখান থেকে।

নলিন বলল, বস না একটু। নারীর মন ঘন ঘন দিক পরিবর্তন করে।

কিন্তু এই খুশির আসর এক মূহূর্তে নীরব হয়ে গেল ভজনের গোঁ গোঁ শব্দে। হঠাৎ ভজন মৃগী রুগীর মত হাত পা ছুঁড়ে মেঝেতে পড়ে গেল। কি যে হ'ল ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারল না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বিস্ময় আর আতংকভরা অদ্ভুত একটা চিঠি দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে। গাঢ় অন্ধকারে নিস্তব্ধ ক্ষীণ আলোয় বুক কেঁপে উঠল ওদের। কি যেন ঘটতে চলেছে তারই সংকেত আছে চিঠিতে। ভজনকে মৃতের মত দেখাচ্ছে, একটা অদৃশ্য শক্তি যেন ওর ওপর ভর করেছে।

কয়েকজন ধরাধরি করে ভজনকে অন্য ঘরে নিয়ে চলে গেল। তারপর সকলেই রুদ্ধশ্বাসে চিঠিটা পড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু কি আশ্চর্য, এই হিজিবিজি লেখাটা কেউই উদ্ধার করতে পারল না। সকলের মনেই এক প্রশ্ন, কি লেখা আছে? কে লিখেছে? কেন লিখেছে? তবে কি এটা কোন ভৌতিক ব্যাপার?

রহস্যের লক্ষ্যভেদ করে কেউ যখন লেখাটা উদ্ধার করতে পারল না, তখন সকলেই ভজনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ভজন উঠে বসেছে আচ্ছন্ন ভাবটা তখনও কিন্তু কাটেনি। তবু ইংগিত করল চিঠিটা আনতে। হাতে নিয়ে একদৃষ্টিতে লেখাটার দিকে তাকাল ভজন। আর তখনই আস্তে আস্তে ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগল। ভজন দেখল অক্ষরগুলো জোনাকীর আলোর মত মিটমিট করে দ্বিভুজ-চতুর্ভুজ নানা ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইভাবে কিছুক্ষণ ঘোরার পর একটা সরল রেখার আলোয় অক্ষরগুলো থামল। আর সেই মুহূর্তেই ভজনের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল। 'One of you will die'.

বার তিনেক লেখাটা পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ভজন। ওর

হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে সকলেই পড়ল। চোখে মুখে ভয়-মিশ্রিত কুটিল চাউনিতে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে।

সেই বিদেশী মানুষগুলোও ধাঁধার রহস্যে এমনই আছন্ন যে একটা কথাও বলতে পারছে না। একজন প্রৌঢ় ইংরেজ কেবল মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল। তাঁকে খুব বিষণ্ণ এবং চিন্তিত মনে হ'ল।

হঠাৎ একটা কালোছায়ার মত ঘরে ঢুকলেন মিসেস দত্ত। কিন্তু কেউ তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন না। কারণ সকলেই তখন মৃত্যু চিন্তায় অস্থির।
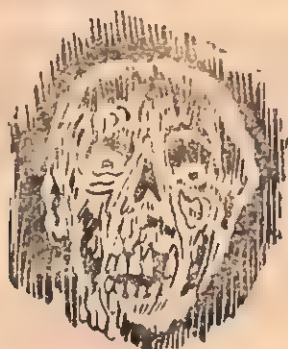
রুবী বলল, চলুন খেতে বসবেন চলুন। মা ডাকছেন।

ভজন ছাড়া সকলেই খেতে বসল, কিন্তু খাওয়াতে কারও মন নেই। সকলের মনেই এক চিন্তা। চোখের দেখা লেখাটা তো মিথ্যে নয়। তবে, আমি নিশ্চয়ই মরব না। এই মৃত্যু ভাবনাটা ওদের এত ভাবিয়ে তুলেছে যে, একজন না মরা পর্যন্ত কারও মনে শান্তি নেই। খাওয়া শেষে ভজন আর নলিন ছাড়া সকলেই বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে গেল। মিঃ দত্তই ভজনকে যেতে দিলেন না, কারণ সে তখনও সুস্থ হয়ে উঠে নি।

হোটেলের জন্মদিনে আনন্দের মাঝে বিষাদের ছায়া ঘনীভূত হয়ে উঠতেই মিঃ দত্ত খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। সকলকে শুতে বলে নিজে গেলেন অন্য ঘরে।

রাত গভীর হ'ল। মা আর মেয়ের চোখেও ঘুম নেই। মিঃ

দত্তের ও একই অবস্থা। পাশের ঘরে চেয়ারে বসে আলো ছায়ার খেলার মাঝেই বই পড়ছেন তিনি।

মিসেস দত্ত বললেন, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর মা রুবী।

কি করব, ঘুম যে আসছে না মা।

মিসেস দত্ত মেয়ের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। চিঠির ব্যাপারটা শুধু ওকে নয় সকলকেই ভাবিয়ে তুলেছে। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

ওপরের ঘরে ভজনের পাশের খাটেই নলিন শুয়ে আছে কিন্তু তার চোখেও ঘুম নেই। স্মৃতিপটে জেগে উঠছে লেখাটা। ভৌতিক ঘটনাটা যেন ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তবু চোখ বন্ধ করে আছে নলিন।

একটা ছায়া পড়ল দরজায়। সে ছায়া আস্তে আস্তে লম্বা হয়ে স্পর্শ করল ভজনের শয্যা। তখনই ভজনের মনে হ'ল ছুরির ফলার খোঁচা মেরে কে যেন গায়ে জ্বালা ধরাল। একটা প্রেতাত্মা ওকে আকর্ষণ করছে। সত্যি একটা প্রেতাত্মা ওকে আকর্ষণ করে খাট থেকে টেনে নামাল। ফিরে তাকাল ভজন বুঝল প্রেতাত্মা ওকে ডাকছে।

প্রেতের ইচ্ছাশক্তি ভজনকে আউট হাউসের দিকে টেনে নিয়ে গেল। তারপর সেই পরিত্যক্ত আউট হাউসটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। কোথা থেকে একটা আলো এসে পড়ছে জরাজীর্ণ অন্ধকারময় সুড়ঙ্গের মধ্যে। ভজন দেখল সুড়ঙ্গটা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। খুব সম্ভব সেই মরা গাছটার পাশ দিয়ে ভূত-কুঠির কোন ঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে সুড়ঙ্গটা। এদিক ওদিক বার কয়েক তাকাতেই হঠাৎ ভজনের নজর পড়ল কতকগুলো চকচকে জিনিসের উপর। ভারি অশ্চর্য হ'ল সে আর তখনই তার মনে হ'ল কার যেন একটা শীর্ণ হাত ওকে সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ও এগিয়ে যেতেই ছাদটা মাথায় ঠেকল। অগত্যা হাঁটু গেড়ে এগিয়ে যেতে লাগল ভজন। এক জায়গায় সুড়ঙ্গটা এত সরু যে যাবার কোন উপায় নেই। তবু বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে

যেতে লাগল। একটা বিশ্রী গন্ধ এবড়ো-খেবড়ো ইটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে। শ্বাসরোধ হয়ে যাচ্ছে ভজনের। এ অবস্থাতেই অাঁধারের বুক চিরে সরীসৃপের মত এগিয়ে গেল সে।

সেই মৃত গাছটার শিকড়গুলোর কাছে এসে দৃষ্টি শক্তি বেড়ে গেল ভজনের। অাঁকা বাঁকা শিকড়ের জটাজালে আটকে রয়েছে অনেক মোহর। হ্যাঁ, মোহরই তো? আনন্দের আবেগে রক্ত টগবগ করে উঠল ভজনের। পাগলের মত চিৎকার করে বলল, পেয়েছি—পেয়েছি—কিন্তু ভয়ংকর অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য ওর সমস্ত আনন্দকে মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিল। ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল ওর সমস্ত শরীর। কি দেখল ভজন? দেখল মোহরের স্তূপের উপর মড়ার মাথায় বসে আছে এক বিষধর সাপ। ক্রুদ্ধ ফণা বিস্তার করে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ল সাপটা। কুটিল চোখে একবার তাকিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল ভজন। তখন ওকে দেখলে মনে হত, ও যেন সমাধির অতল তলে কফিনের ঢাকনায় আবদ্ধ হয়ে গেছে।

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও ভজন মড়ার মাথা আর সাপের পাশ দিয়ে মোহরে থাবা বসাল। মুহূর্তে ওকে অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে কে যেন টেনে হিঁচড়ে সুড়ঙ্গের বাইরে নিয়ে আসতে লাগল। প্রেতের টানা হেঁচড়ায় ভজনের হাঁটু কনুই থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। সুড়ঙ্গের বাইরে এসে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই সাপের বরফ শীতল স্পর্শে মাগো করে ছিটকে পড়ল সে। তারপর যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে অন্ধকার পথ হাতড়ে বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভজন। সে শব্দে নলিনের ঘুম ভেংগে গেল। তাড়াতাড়ি মোম জ্বালাল নলিন. দেখল ভজন বিছানায় আড়াআড়ি শুয়ে উত্তেজিত ভাবে আপন মনে কি যেন বলছে।

নলিন বলল, কি হ'ল রে ভজন?

কথা শুনে হিংস্র পশুর মত নলিনের দিকে তাকাল ভজন। তার হাব ভাব দেখে নলিন ভাবল, নিশ্চয়ই ভৌতিক ঘটনার নানা প্রতি-ক্রিয়াই ওকে বীভৎস করে তুলেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য ভজনের দিকে তাকাতেই নলিনের স্নায়ুগুলোও কেমন যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। একটা

সম্মোহন শক্তি যেন প্রয়োগ করছে ভজন।

ভজনের ব্যাপারটা বোঝার জন্য নলিন ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পরে ঠং করে শব্দ হতেই নলিন চেয়ে দেখল ভজনের কাছে একটা মোহর। ভজন মোহরটা কুড়িয়ে উল্টে পাল্টে বেশ খানিকক্ষণ দেখে বালিশের নিচে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

নলিন তার সব গতিবিধি লক্ষ্য করে যখন বুঝল ভজন ঘুমিয়েছে তখন ভাবলো আর দেরি নয়। উঠে দাঁড়াল নলিন। চারদিক তাকিয়ে সমস্ত পরিস্থিতিটা দেখে নিঃশব্দে ভজনের বালিশের তলা থেকে মোহরটা নিয়ে ভীতিবহ্বল চোখে তাকাতে তাকাতে সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

নলিন যাওয়ার কিছু পরেই ভজনের ঘুম ভেংগে গেল। দেখল ঘর অন্ধকার। বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হ'ল ভজনের। মোম জ্বালাতে গিয়ে মোম দেশলাই পেল না। কারণ নলিন ওগুলো সরিয়ে রেখে গেছল। ভজন অস্ফুটস্বরে ডাকল নলিনকে।

কোন সাড়া পেল না। চকিতে বালিশের তলায় হাত দিয়ে দেখল মোহর নেই। ডুকরে কেঁদে উঠল ভজন। বুঝল নলিন মোহর নিয়ে সরে পড়েছে। আবার ভাবল ভূতের মোহর ভূতেও নিতে পারে—কিন্তু নলিন গেল কোথায়? বিছানা থেকে উঠে পাগলের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ভজন।

ভজনের ছুটে বেরিয়ে যাবার সময় ধুপ ধাপ শব্দে ঘুম ভেংগে গেল মিঃ দত্তের। জানলায় তাকিয়ে দেখল কে যেন ছুটে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মিঃ দত্ত বললেন, কে? কে ওখানে?

কোন উত্তর নেই। ভীষণ ভয় পেয়ে ঠাকুর চাকরদের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন মিঃ দত্ত।

কর্মচারিরা ছুটে এসে মালিকের দিকে তাকিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা বুঝতে পাচ্ছে না ব্যাপারটা কি!

মিঃ দত্তের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। নিরুত্তাপ শরীর আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে সরীসৃপের ন্যায় বেঁকে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে ঘটছে যেন মৃত্যুর পদক্ষেপ। ক্রমশ কাঁপতে কাঁপতে কাৎ হয়ে পড়লেন মিঃ দত্ত। মুখ থেকে শুধু একটাই শব্দ ঃ ভূ-উ-ত।

মিঃ দত্তকে নিয়ে সকলেই ব্যস্ত। বৌ মেয়ে তো কান্না সুরু করে দিল। প্রায় ঘন্টাখানেক পর মিঃ দত্ত সুস্থ হয়ে বললেন, আমি দেখেছি, ও ভূত ছাড়া কিছু নয়।

দিবাকর ঠাকুর বলল, আপনি নলিনবাবু, ভজনবাবুকে দেখেন নি তো? ওরা ওপরে শুয়ে ছিলেন।

দিবাকরের কথায় কয়েকজন ওপরে গিয়ে দেখল ঘরে নলিন ভজন কেউ নেই। বুঝল এদেরই কাউকে দেখে মিঃ দত্ত ভয় পেয়ে থাকবেন।

দিবাকর মালিককে বলল, আপনি বোধ হয় নলিন, ভজনকে দেখে ভয় পেয়েছেন। ওরা চলে গেছেন।

কথাটা শুনে ভয় মিশ্রিত চোখে দিবাকরের দিকে তাকালেন মিঃ দত্ত। গাঢ় অন্ধকারে মিসেস দত্তের গলা শোনা গেল, রুবী শুবি চল। রাত তিনটে বাজল।
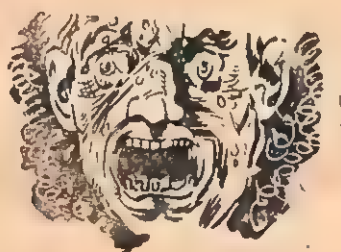
গত রাতের সেই ভৌতিক চিঠিটা সবাকেই ভাবিয়ে তুলেছে। রাতটা যে সকলের অশান্তিতে কেটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয় প্রচণ্ড একটা উত্তেজনা প্রতি মুহূর্তে ওদের মস্তিষ্কের কোষে কোষে শিহরণ জাগাচ্ছে। সকলেই ভাবছে, একজনের মরা দরকার। তবে নিজেকে বাদ দিয়ে। সকালে ঘুম ভাঙতেই একে অন্যের

খোঁজ করল কেউ মরেছে কি না। ভূতের লেখাটা তো মিথ্যে নয়?

নলিন সকালেই সেই মোহর নিয়ে স্যাঁকরার দোকানে বসে ভাবছে বাড়িটা যখন বিনা কিনেছে তখন ওই মরবে। পরক্ষণেই ভাবল ভরত ঝোপ জংগল কেটে বাড়ি পরিষ্কার করে ভূতদের উৎখাত করেছে সে ও তো মরতে পারে। আবার ভাবছে হৈ হুল্লোড় করে রাত দিন মিঃ দত্ত ভূতদের বিরক্ত করছেন, তাদের ও কেউ মরতে পারে। আবার ভূত যে ভজনের উপর রেগে আছে তা তো কাল থেকেই দেখতে পাচ্ছি। শেষে ওর মনে হল ভূতের মোহর তো আমি চুরি করেছি কাজেই আমার মৃত্যুই আসন্ন। আমি নিশ্চয়ই মরে যাব। কথাটা ভাবতেই ওর মনে একটা চাপা ভয়ের উদ্রেক হল।

সোনার দোকানের মালিককে আসতে দেখে শ্যামাকালীর মন্দিরের দিকে চলে গেল নলিন।

পিছনে কতকগুলো মানুষের কণ্ঠে বল হরি হরি বোল ধ্বনি শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। একদল লোক স্বর্গদ্বার শ্মশানের দিকে মৃতদেহ কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। কি যেন ভাবতে ভাবতে মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়াতেই নলিন দেখল, বিনায়ক আদুল গায়ে মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরিয়ে আসছে। পুরোহিত বিনায়কের দীর্ঘ জীবন কামনা করে জোরে জোরে মন্ত্র পড়ছে।

সূর্যের সোনালী রোদ ছড়িয়ে দিয়েছে মন্দির চত্বরে। মুখোমুখি হ'ল নলিন আর বিনায়ক।

নলিন বলল, কি ব্যাপার এত সকালে পুজো দিতে এসেছিস? তোর তো আটটার আগে ঘুম ভাঙে না।

বিনায়ক বলল, তুই কি করতে এসেছিস?

সে তোর জানার দরকার নেই। তবে এটা ঠিক যে ভূতের ভয়ে তোর মত মন্দিরে আসি নি।

না। বলছিলাম, তুই-ই বা এখানে কেন?

সে কথা পরে বলছি। তার আগে বল দেখি কেউ মরছে কি না?

একটা মড়া অবশ্যি শ্মশানের দিকে নিয়ে যেতে দেখলাম।

কথাটা শুনে চমকে উঠল বিনায়ক। ফিস্ ফিস্ করে বলল, কে মরল রে? ভজন—না, সেই সাহেবগুলোর মধ্যে কেউ?

মন্দিরের পুরোহিত বলল, মুচিসাহির বাঁকু মহান্তি।

কথাটা শুনে খুশি হ'ল না ওরা। বাঁকু না মরে গত রাতে ভূত-কুঠিতে যারা ছিল তাদের কেউ মরলে খুশি হ'ত। আর কথা না বাড়িয়ে বিনায়ক চলে এল শম্ভু বোসের চায়ের দোকানে। নলিন গেল মাসীর বাড়ির দিকে।

একটু পরে শম্ভু বোসের চায়ের দোকানে এসে ঢুকল ট্যুরিস্ট গাইড মানস ব্যানার্জী। ইদানিং এক ফরাসী মহিলাকে গাইড করতে গিয়ে মানস নিজেই তার গাইডে পড়ে গেছে। মহিলাটি বোধহয় মানসকে ছেড়ে আর ইণ্ডিয়ার বাইরে যাবেন না। অর্থাৎ পাকাপাকি ভাবে একটা খাট বিছানার কথাই ভাবছেন ওরা।

এ বিষয়ে মানসকে প্রশ্ন করলে সে বলে, বিদেশকে বা বিদেশিনীকে আপন করে নিতে না পারলে দেশের উন্নতি নেই। তা ছাড়া বিদেশী জিনিসের মত এ দেশে বিদেশী মহিলারও কদর বেশি। এ হেন মানস বাড়ুজ্যে চায়ের দোকানে ডজন খানেক সাহেব মেম নিয়ে আসর জমিয়ে বসে আছে।

মানস বেশ উত্তেজিত ভাবেই সাহেবদের বলল, ভূত আপনাদের দেশেও আছে, আমাদের দেশেও আছে। শুধু তাই নয়, সারা পৃথিবীতে এখন ভূতের রাজত্ব চলেছে। তবে ইণ্ডিয়া একটু স্বতন্ত্র।

একজন সাহেব বলল, সট্ন্ত্র কি?

গণতন্ত্রের ছোট ভাই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ইণ্ডিয়াতে আপনারা সর্বত্রই ভূত দেখতে পাবেন। এ বিষয়ে ইণ্ডিয়ানরা খুবই গর্বিত। গর্বিত এই কারণে যে, ভূত প্রোডাকসানে ইণ্ডিয়া পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। এ ভাবে চালিয়ে যেতে পারলে আর কয়েক বছরের মধ্যে আমরাই পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করব।

মিসেস কিটি বলল, ইণ্ডিয়ার অনেক জায়গা তো ঘুরলাম, কই

কোন ভূত তো দেখি নি।

সে কি! দমদম এয়ার পোর্টে নামার পর ভি. আই. পি. রোড দিয়ে যখন আসছিলেন তখন ভূত আপনার গাড়ি থামিয়ে রিভলবার দেখিয়ে সর্বস্ব কেড়ে নেয় নি?

লুসি উত্তেজিত হয়ে বলল, ওঃ! সে কি ডেঞ্জারাস পিপুল।

মানস বলল, পিপুল নয় ও গুলোই ভূত। আমি এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি, ওই ভূতগুলোই স্বাধীন ভারতের প্রোডাক্ট।

শম্ভু বোস চা দিতে দিতে বলল, আপনারা থানায় গেছলেন? গভর্ণমেণ্টকে জানিয়েছেন?

জানিয়েছি। কিন্তু পাশপোর্ট পর্যন্ত ফেরৎ পাই নি।

মানস বলল, থানায় জানিয়েই তো ভুল করেছেন। ইণ্ডিয়ান ভূত থানার ভূতদের রসদ দিয়েই আপনাদের কাছে রসিকতা করতে গেছল।

কিটি বলল, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তো আমাদের মত টুরিস্টদের কথা ভাববেন—

এই মরেছে? এ শ্বেতহস্তীনি যে আবার সরকারকে টানছে।

লুসি বলল, কি বললেন?

বলছি, আপনাদের জানা দরকার আমাদের সরকার জনগণের জগন্নাথ। পাও নেই, হাতও নেই। আছে চোখ। তাও ঠুলি আঁটা। ওই সব ভূতকে কোন মন্ত্রী ক্ষেপাতে চায় না। কারণ ভোটের সময় ওরাই মন্ত্রীর বাহন, মারণ, উচাটন, বশীকরণ।

কিটি বলল, গত রাতে যে ভৌতিক পত্র আসিল, তাহা কি কোন মন্ত্রীর আশ্রিত ভূত আনিয়া ছিল?

মানস মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, লেখাটা যখন ইংরেজী—তখন উহা বিদেশী ভূতের কাজ।

মানসের কথার প্রতিবাদ করল এক সাহেব। অসম্ভব?—, আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে মিঃ গাইড—যে ইণ্ডিয়ার রক্তে কতটা ইংরাজ রক্ত মিশিয়া আছে। অতএব আপনি কি হলপ করে বলতে পারেন,

উহা ইণ্ডিয়ান ভূতের কাজ নয় ?

পারি। কারণ ও লেখাটায় কোন ভেজাল নেই।

ভেজাল ? উহা কি রূপ দেখিতে। কোথায় থাকেন ?

তিনি সর্বত্র আছেন। ওই যে রসগোল্লা খাচ্ছেন ওতেও ভেজাল ভূত আছে।

হোয়াট। বলেই লুসি বমি করতে গেল। মানস হাঁ হাঁ করে বলল, বমি করবেন না, ওতে ভূতের রাগ হবে।

কথা শুনে মুখের বমি ভক করে গিলে ফেলল লুসি। আর তখনই কিটি বলল, গত রাতের ম্যাসেজটিও তো ভেজাল ভুটের হইতে পারে।

না, হতে পারে না। কারণ লেখাটা বিশুদ্ধ ইংরাজী। কেউ যদি মরে তো আপনাদেরই একজন মরবে।

মানসের কথায় বিদেশীগুলো এত চটে গেল যে তেড়ে মারতে এল। হঠাৎ বিনায়ক এসে পড়ায় ঝামেলাটা মিটল। আর তখনই মানসের প্রিয় ফরাসী মহিলা বলল, মিঃ ব্যানার্জী, টুমি কি আমার মৃত্যুর ইঙ্গিট করলে ?

ও কথা কেন ডার্লিং।

আমার সমস্ত অর্থই তো এখন তোমার নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছি কিনা, টাই।

মানস গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, তুমি নিশ্চয়ই ইংরেজ নও। কথা শুনে সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

শম্ভু বোসের মিষ্টির দোকানের আসর থামলেও ও দিকে কিন্তু মিঃ দত্তের হোটেলে ভূতের কেত্তন সুরু হয়ে গেছে। সারারাত ঘুমতে না পারায় সকাল নটা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছেন মিঃ দত্ত। ওঠার নাম নেই। বিরক্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন মিসেস দত্ত। বললেন, অনেক বেলা হয়েছে, উঠে পড়।

স্ত্রীর ডাকে বেশ বিরক্ত হয়েই উঠে বসলেন মিঃ দত্ত। চোখ রগড়ে হাই তুলে বললেন, শান্তিতে একটু ঘুমোতেও দেবে না ?

ঠিক তক্ষুণি রেসের ঘোড়ার মত লাফাতে লাফাতে এসে দাঁড়াল

রুবী। বাবা গোপীনাথবাবু এসেছিলেন তোমার সাথে দেখা করতে।

না, আমার সাথে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। উনি বোধ হয় তোমার মার কাছে এসে ছিলেন। যাও, চা দিতে বল। রুবী চলে যেতেই মিঃ দত্ত গিন্নীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। কি ব্যাপার সাত সকালে স্নান সেরে চললে কোথা? সেজেছ তো খুব।

গোপী গোঁসাইয়ের আশ্রমে যাব।

সে তো বুঝতে পারছি। তা যার জন্য এত উতলা তাঁর ইতিহাস জান? লোকটি কিন্তু খুব সুবিধের নয়। আগে কালী ভজে ভৈরবী খুঁজত. এখন কৃষ্ণ ভজে রাধা খুঁজছে।

কি আজে বাজে বকছ?

বকছি কি সাধে। হারামজাদা এক নম্বরের জোচ্চর। দুদিন বাদে হোটেলটাই না আমার প্রেমকুঞ্জ হয়ে যায়।

অত সব শুনতে চাই না। রাতে যে কাণ্ড করেছ তাতে চুপ করে থাকা যায় না। যাও, স্নান সেরে এস। গোঁসাইজী তোমার শান্তির জন্য যুজ্ঞি করতে আসবেন। উনি বলে গেলেন তোমাকে ভূতে ধরেছে।

কি বললে ভূতে ধরেছে. যজ্ঞ করতে আসবেন। একবার পেলেই আমিই বেটার যোগ্য ব্যবস্থা করে ছাড়ব। রুবী—রুবী কোথায় গেলি। এই যে শোন, আমার সেই বাঁশের লাঠিটা দিয়ে যা।

বলি হচ্ছেটা কি? ভদ্রলোক শান্তি করতে আসছেন তাঁকে লাঠিপেটা করার কি আছে?

শান্তি করতে, হুঁ শান্তি। শান্তি নয় অশান্তি। বুঝলে গিন্নী অশান্তি।

রুবী তোর বাবার কথাবার্তা শুনে কি মনে হচ্ছে? এসব কি তোর বাবার কথা। না, কখনও না। ও সব ভূতের বাক্যি। এদিকে আয় ধর তোর বাবাকে।

বলতে বলতে টেনে হিঁচড়ে মিঃ দত্তকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে মাথায় হড় হড় করে জল ঢালতে লাগলেন মিসেস দত্ত। ঠাণ্ডা জলে মিঃ দত্তের

শরীর থরথর করে কাঁপছে। গিন্নীর হঠাৎ আক্রমণে কাপড়টা গুছিয়ে পরতে পারেন নি। কোমর থেকে কাপড় খসে যেতেই মিঃ দত্ত বলে উঠলেন, আমি যে দিগম্বর হয়ে গেলুম গো।

হলেও কেউ দেখতে আসবে না। ঝাঁঝাল গলায় কথাটা বললেন মিসেস দত্ত।

ঠাকুর চাকরগুলো মালিক আর মালিক-গিন্নীর রহস্যটা কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। তবে ঘরের মধ্যে কিছু যে একটা ঘটছে তা বেশ অনুমান করতে পারছে।

মিসেস দত্ত ভাল কাপড় জামা পরিয়ে চেয়ারে কর্তাকে বসাতেই রুবী সহানুভূতির সাথে জলখাবার দিয়ে গেল। এবং মা যে বাবাকে চিরদিন শাসন করে আসছে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে ঘরে ঢুকলেন গোপী গোঁসাই। আর যায় কোথা আহত সিংহের মত লাফিয়ে উঠলেন মিঃ দত্ত। চেঁচিয়ে বললেন, ভূত ছাড়তে এসেছে! এস, তোমার ভূতই আগে ছাড়াই। বলেই চা শুদ্ধ কাপটা ছুঁড়ে মারলেন। হারামজাদা দেখাচ্ছি মজা। লাঠি হাতে তুলতেই গোঁসাই ঘাবড়ে গিয়ে ভূত ভূত করতে করতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল।

বিনায়ক আসছিল হোটেলের দিকে। গোঁসাইকে দৌড়তে দেখে বলল, কি হ'ল গোঁসাইজী? কি ব্যাপার?

ভীষণ ব্যাপার মশাই, ভীষণ ব্যাপার। মিঃ দত্ত ক্ষেপে গেছেন আর

একটু হলে খুন করে ফেলত মশাই। আপনি যেন ও দিকে যাবেন না। হাঁপাতে হাঁপাতে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল গোঁসাইজী।

আমি ওঁর কাছেই যাচ্ছি।

খবরদার। ওর কাছে গেলে নির্ঘাৎ মরে যাবেন! এই সা লাঠি নিয়ে বসে আছে বলেই আবার দৌড়।

বিনায়ক ব্যাপারটা কিছুই বুঝল না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হোটেলে এসে দেখল আরামচেয়ারে বসে মিঃ দত্ত কাকে যেন ধমকাচ্ছেন। মাথা দিয়ে দর দর করে আঠাল ঘাম গড়িয়ে পড়ছে তাঁর। বিনায়ককে কাছে পেয়ে বলে উঠলেন, বুঝলেন বিনায়কবাবু, এ হচ্ছে শত্রুতা।

অসম্ভব কিছু নয়।

আমি থানায় ডাইরী করব।

করাই উচিত।

হ্যাঁ। এইজন্যেই আপনাকে ভাল লাগে। আপনি অন্তত আমাকে বোঝেন।

কিন্তু কে শত্রু আর কার নামে ডাইরী করবেন, তা তো বুঝলাম না।

রুবীর মা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রুবীর মার নামেই আমি ডাইরী করব।

দোষটা কি?

দোষ। আর দশ মিনিট বাথরুমে থাকলে আমি মার্ডার হয়ে যেতাম।

ঠিক আছে, আপনি উত্তেজিত হবেন না। আমি যাচ্ছি ডাইরী করতে।

তাই যান। বলেই টোবাকো ভরা পাইপের মুখে আগুন দিয়ে টান দিতে লাগলেন।

রুবী ইশারা করে বিনায়কবাবুকে বলল, এখান থেকে বাবাকে সরিয়ে নিয়ে যান।

চলুন মামাবাবু, কুলিরা আউট হাউসে কাজ করছে দেখবেন চলুন ?

চল। দুজনেই বেরিয়ে গেল। একটা ঘুর্ণি ঝড় যেন সরে গেল।

মিঃ দত্ত চলে যেতেই রুবী এসে বসল পড়ার বই নিয়ে। ঘন উজ্জ্বল লাল রংয়ের শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে দুরন্ত যৌবনের ঢেউ তুলে পড়ায় মন দিল রুবী।

কিন্তু একটু পরেই ওর মা এসে ঘরে ঢুকল। বলল, তোর বাবা কোথায় ?

আউট হাউসের কাছে।

বাঃ বাঃ, বাঁচলুম। কথাটা বলেই হঠাৎ স্থির দৃষ্টিতে রুবীর দিকে তাকালেন মিসেস দত্ত। সে দৃষ্টি এতো প্রখর যে রুবী ভয় পেয়ে গেল।

অমন করে কি দেখছ মা ?

আয়নায় নিজের মুখটা দেখ।

রুবী উঠে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, তার গালে অদ্ভুত কয়েকটা দাগ।

কেউ যেন গালে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। রুবী মার কাছে ছুটে এসে বলল, এটা কিসের দাগ বলত মা ?

মিসেস দত্ত চুপ করে থাকলেন।

রুবী আবার বলল, কিছু বলছ না যে ?

এতে আবার বলার কি আছে। তুমি তো জান।

না। যা ভাবছ তা নয়। রাতে তো তোমার কাছেই ছিলাম।

তাও তো বটে।

বেশ ভাবিয়ে তুলল ব্যাপারটা। হৃদপিণ্ড প্লাবিত করে রক্তস্রোত মাথায় উঠে যাচ্ছে। মানসিক যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে মা আর মেয়ের চোখে মুখে। তা হলে এটাও কি ভৌতিক ব্যাপার! একজনের মরার কথা, এ কি তারই ইঙ্গিত।

মিসেস দত্ত কেঁদে উঠলেন, রুবী মা আমার। আমাদের ছেড়ে যেন চলে যাস না।

রুবী ওর মার অবস্থা দেখে বুঝল একটা চাপা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। হয় তো ভাবছেন আমি এখনই মরে যাব।

তোমার ভয় নেই মা, আমি মরব না।

ঘরে ঢুকলেন মিঃ দত্ত। কি হল, কিছু ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ, ঘটেছে। তোমার মেয়ের—বলেই মেয়ের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন মিসেস দত্ত। ভারি আশ্চর্য তো! কোথায় গেল সেই দাগগুলো?

মার কথা শুনে রুবী ছুটে গিয়ে আয়নায় দেখল দাগটা মিলিয়ে গেছে। এ ব্যাপারটায় ভীষণ একটা উত্তেজনা প্রকাশ পেল রুবীর মধ্যে। বঁড়শির মত নাকের উপর হীরের নাকচাবিটা পর্যন্ত নিঃশ্বাসের সাথে সাথে ওঠানামা করছে।

ঘটনাটা শোনার পর মিঃ দত্ত মন্তব্য করলেন, এ হতেই পারে না। অসম্ভব।

রহস্যটা ওখানেই চাপা পড়ে গেল।

একটু পরেই একটা কুলি ছুটে এসে বলল, বাবু একটা সিন্দুক পাওয়া গেছে। কথাটা শুনেই মিঃ দত্ত তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ালেন আউট হাউসের সামনে। সজাগ দৃষ্টিতে কুলিদের দিকে মিঃ দত্ত আর বিনায়ক তাকিয়ে আছে। যেন কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে সিন্দুক থেকে। রহস্যপুরীর গহ্বর থেকে শংকর মিস্ত্রি কুলিদের দিয়ে বাইরে বার করে আনছে সিন্দুকটি। চকিতে রুবীও বালির ওপর কালের পদচিহ্ন রেখে দ্রুত এগিয়ে এল। তারই পাশে অনিন্দ্যসুন্দর মুখে কালো চোখের তারায় তারায় কাজলের রেখা টেনে যে তেলেগু মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে তাকেই বলল, কি রে কামনা, কিছু পাওয়া গেছে মোহর-টোহর?

কামনা খুশিতে ভরপুর। সিন্দুক দেখেই ওর আনন্দ। মোহর কি তা ও জানে না, তাতে ওর প্রয়োজনও নেই। তবে সিন্দুকটা পেলে ওরা মাছের জালগুলো রাখতে পারত।

বিনায়ক ভাবছে এখন সিন্দূক খোলা চলবে না। সোনাদানা থাকলে জানা জানি হয়ে যাবে, যা করার রাতে করব। বেশ ধমকের সুরেই শংকরকে ডাকল বিনায়ক। কুলিদের গোলমাল বন্ধ করতে বলল। তারপর শংকরের কানে ফিসফিস করে কি যেন বলল সে, আর তখনই কথা বন্ধ হল সকলের।

সিন্দূকটা বাইরে বার করতেই সকলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর। মানুষের হাতের চাপে টুং ঠাং শব্দ হ'ল সিন্দূক থেকে। তা দেখে রুবী চেঁচিয়ে উঠল, পিয়ানো, পিয়ানো, বলেই মার কাছে ছুটে এল। দেখবে চল মা, পিয়ানো পাওয়া গেছে।

যাই হোক একটা কিছু যে পাওয়া গেছে তাতে সকলেই খুশি। মেয়ের কথা শুনে উলের কাঁটা ফেলে মিসেস দত্ত স্বামীর কাছে এসে গদগদ হয়ে বলল, ও মা, তাই তো। এটা বোধ হয় মিসেস জ্যাকসনের পিয়ানো ছিল।

এখন তো আমার। কি বলুন মিঃ দত্ত, কথাটা বলল বিনায়ক।

নিশ্চয়ই।

কিন্তু আপনি কি করবেন এটা নিয়ে। রুবী কথাটা বলেই মুচকি হাসল।

আপনার বুঝি পছন্দ হয়েছে ?

হওয়াই স্বাভাবিক।

তা হলে ওটা আমি আপনাকেই দিলাম।

কথা শুনে খিলখিল করে হাসল রুবী। সে হাসিতে বিনায়কের মন ভরে গেল। চোখ দুটো চকচক্ করে উঠল। এ যেন অশনি সংকেতের পূর্বাভাস।

বিনায়কের হাব ভাব আড়চোখে দেখলেন মিসেস দত্ত। কিন্তু এক কথায় এমন একটা জিনিস যে তার মেয়েকে দিয়ে দিতে পারে, সে যদি দু একবার মেয়ের দিকে রসের চাউনি চায়, দোষ কি ?

আসুন একটু চা খেয়ে যাবেন, রুবী বলল কথাটা।

বিনায়ক বলল, আমাকে বলছেন ?

হ্যাঁ।

বিনায়ক বেশ লাজুক ভাবে রুবীর সাথে গিয়ে ঢুকল হোটেলে। মিসেস দত্ত গদগদ হয়ে বলল, বাড়িতে ভূতই থাক আর প্রেতাত্মাই থাক এ বাড়ি আমরা ছাড়ছি না।

আমিও তাই চাই।

রুবী চা খেতে খেতে বিনায়কের ঘাড়ের কাছে এসে ন্যাকা ন্যাকা ভাবে বলল, আমার না ভীষণ শখ ছিল পিয়ানোর। ওর ন্যাকামিতে বিরক্ত হয়ে মিঃ দত্ত বললেন, শখ তো মিটেছে, এখন যাও দেখি পড়গে।

ওদের কথার মাঝেই সূর্য মধ্য গগনে সরে গেছে। বিনায়ক বাড়ি ফিরে গেল। রুবীদের খাবার সময় হ'ল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করে ভৌতিক বাড়িটার ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল লণ্ঠনের আলো। দেখতে দেখতে সমুদ্রের লোনা বাতাস ক্ষিপ্রবেগে গ্রাস করে ফেলল সারা বাড়িটাকে। ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে সাইনবোর্ডটা পড়ে গেল, আর তখনই রাত্রির কথা চিন্তা করে হোটেলের মানুষগুলোর মুখের চেহারা ধূসর বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগল।

রাত আটটা। দত্তসাহেব গল্পের বই পড়ছেন। চা দিয়ে গেল দিবাকর। মিসেস দত্ত পট থেকে চা ঢালছেন এমন সময় কানে এল খস্‌খস্‌ শব্দ। সজাগ দৃষ্টিতে অসম্ভব কিছুর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন সকলে। মনে হচ্ছে ইট কাঠ বালির স্তূপে স্তূপে জমে থাকা দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে কেউ যেন এদিকে এগিয়ে আসছে।

খুব ধীরে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে দরজা খুলে গেল। লণ্ঠনের আলো-ছায়ায় অস্পষ্ট একটা হাত দেখে মিসেস দত্তের হাত থেকে চায়ের পটটা পড়ে গেল।

মিঃ দত্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, কে? কে ওখানে?

আমি শ্যামল। স্টেশন থেকে যাত্রী নিয়ে এসেছি।

তা ও ভাবে কেন? ইডিয়ট।

দুজন এসেছেন, কত নম্বর ঘর দোব?

যে ঘর পচ্ছন্দ হয় ওঁদের সেই ঘরই দেবে।

নবাগত দম্পতি এতক্ষণে হোটেলের পরিবেশটা বোঝার চেষ্টা করছিল।

শ্যামল ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, উনি আমাদের মালিক। কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন ওঁকে।

মহিলাটি বলল, আর কোন বোর্ডার নেই?

সঙ্গে সঙ্গে শ্যামল বলল, কি যে বলেন বৌদি। আর আধ ঘণ্টা আগে এলে জায়গাই দিতে পারতাম না। এই তো ঘরগুলো খালি হ'ল, কলেজ পার্টি এসেছিল কি না। বলেই দিবাকরের দিকে তাকিয়ে শ্যামল বলল, কতজন ছিল দিবাকর?

তড়াক করে দিবাকর বলল, বাহান্নজন।

শুনলেন তো। চলুন ঘর দেখবেন। ওপরে নিয়ে গেল শ্যামল।

ভদ্রলোক বলল, বড্ড অন্ধকার।

অন্ধকার কোথায় নেই স্যার।

তা যা বলেছেন। আমাদের কলকাতা, সে তো অমাবস্যার চাঁদ।

হে-হে-হে। তবেই বুঝুন কি সুখে আছি।

সমুদ্র-মুখী ঘর পেয়ে ওরা খুশি হল। দিবাকর লণ্ঠন আর মোমদানী রেখে ভদ্রলোকেদের জন্য বিছানা পেতে দিল। একজন চা নিয়ে এল।

হোটেলের প্রথম বোর্ডার পেয়ে সকলে এমন তোয়াজ করল যে প্রথমটা ঘাবড়ে গেল ওরা।

এ সব ব্যাপারে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়, যত তাড়াতাড়ি এসব বোর্ডারকে ঘরে রেখে টাকা অগ্রিম নিতে পারলেই ব্যস, কেল্লা ফতে। পালাবার পথ নেই, গেলেও একদিনের দণ্ড দিয়ে যেতে হবে। এসব শ্যামল ভালই জানে। আর এটা জানে বলেই হোটেলে ওর এত কদর। বাকপটুতা আর মিথ্যার মায়াজালে আকৃষ্ট হয়ে ভদ্রলোক চল্লিশ টাকা অগ্রিম দিতেই শ্যামল চলে গেল।

মালিকের হাতে চল্লিশ টাকা দিল শ্যামল।

মিঃ দত্ত বললেন, ওদের অত মিথ্যে কথা বললে কেন ?

সত্যি কেউ বিশ্বাস করে না স্যার।

তুমিও না।

আমি তো মিথ্যাকে আশ্রয় করে বেঁচে আছি। না হলে বি. এস. সি. পাশ করে দেড়শ টাকার চাকরি করব কেন ? কথাটা বলেই শ্যামল চলে গেল। জীবনের ব্যর্থতা মাঝে মাঝে সত্যি ওকে বিদ্রোহী করে তোলে।

শ্যামলের কথায় গম্ভীর হয়ে গেলেন মিঃ দত্ত। তা দেখে মিসেস দত্ত বললেন, ব্যবসা করতে গেলে লোকে একটু আধটু মিথ্যে বলে। তাতে দোষের কি আছে।

আধ ঘন্টার মধ্যেই জামা কাপড় সায়া ব্লাউজ টুথপেষ্ট আয়না চিরুণি টুকিটাকি জিনিসগুলো গুছিয়ে মুখ হাত ধুয়ে চায়ের কাপ নিয়ে মুখোমুখি বসল অশোক আর মুনমুন। এরা দুজনেই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে। অভিনয়ই ওদের পেশা। আয় ভালই, তবু মনে দ্বিধা অশোকের, আমরা কি সুখী হতে পারব ?

মুনমুনের যৌবনে বর্ষার প্রথম ঢল নেমেছে। এই পরিবেশে বেশ একটা নতুনত্বের স্বাদ অনুভব করছে। সে ভাবছে দু'জনের চেষ্টায় ছোট একটা সংসার গড়ে উঠতে পারে।

অশোক বলল, হোটেলটা বেশ নিরিবিলি—

তুমি তো এটাই চেয়েছিলে।

বেয়ারা ঘরে ঢুকতেই মুনমুন বলল, শোন, রাতের খাওয়াটা একটু পরেই দিও।

কালো আঁধারের বুক চিরে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের শব্দ কানে এসে লাগছে। অশোক আর মুনমুন গিয়ে দাঁড়াল সমুদ্র-মুখী জানলার কাছে। মুনমুনের একরাশ ঘন কালো কোঁকড়ান চুলের ভেতর থেকে মিষ্টি গন্ধ এসে লাগল অশোকের নাকে। আপন মনেই বলল, আজকের রাতটা বড় সুন্দর।

কথা শুনে হাসল মুনমুন। তারপর অশোককে একটু রাগাবার জন্যেই বলল, তোমার সেই প্রেমিকা রমা দেবীর থেকেও সুন্দর ?

অশোক তাকাল মুনমুনের দিকে। ভাবল অতীতের কবর খুঁড়ে মুনমুন দুর্গন্ধ ছড়াতে চাইছে। এই সুন্দর পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আরো কাছে টানল মুনমুনকে। আদর করে বুকের কাছে টেনে এনে বলল, একটা গান শোনাবে মুনমুন ?

শুনবে! বলেই গুন্ গুন্ করে সুরেলা কণ্ঠে গান ধরল সে। আর ঠিক তখনই ওদের মনে বিস্ময়ের শিহরণ জাগিয়ে কে যেন গানের সুরটা অবিকল পিয়ানোতে বাজাতে লাগল। সুরটা এত মনোমুগ্ধকর যে, তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে সম্বিত হারিয়ে ফেলল ওরা। প্রায় আধ ঘণ্টা পর বেয়ারার ডাকে নিজের জগতে ফিরে এল।

একটু দেরি হয়ে গেল স্যার। বেয়ারা কথাটা বলল।

অশোক বলল, তা হোক। কিন্তু এত সুন্দর পিয়ানো কে বাজাচ্ছিল ? তোমাদের মালিকের স্ত্রী না তার মেয়ে ?

আমি তো রান্নাঘরে ছিলাম।

তাও তো বটে।

খাবার কি এখানে আনব ?

তোমাদের মালিককে বল একসাথেই খাব।

বেয়ারা চলে গিয়ে মালিককে অশোকবাবুর কথা জানাতেই খুশি

হ'ল ওরা। বলল, এমন একজন মোহজাল সৃষ্টিকারী শিল্পীর সান্নিধ্য কে না চায়!

রুবী বলল, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ বাবা, যে সুরটা ওরা বাজাচ্ছিল তাতে পাশ্চাত্য সংগীতের সূক্ষ্ম সুর মিশে আছে।

মিসেস দত্ত বললেন, সেটা তোর বাবার থেকে তুই-ই ভাল বুঝবি।

ঠিক বলেছ। সংগীতের আমি কি-ই বা বুঝি। তবে হোটেলটা আমাদের লক্ষ্মীই বলতে হবে। পিয়ানোর সাথে শিল্পীও জুটে গেল।

মিসেস দত্ত বড় বড় চোখ করে মেয়েকে বললেন, কাল থেকে যতটা পারিস শিখে নিবি ওদের কাছ থেকে।

সে আমি আগেই ভেবেছি। দেখ না, আজ ওদের এমন ডিনার দোব না—

কথা শেষ হবার আগেই অশোক মুনমুন এসে দাঁড়াল ওদের কাছে। খুব আদর যত্ন করে আপন করে নিল রুবী। খাওয়ার টেবিলে প্রচুর খাওয়ার জিনিস আর আপ্যায়ন দেখে ঘাবড়ে গেল ওরা। ভাবল হোটেলের বিল্ বাড়াবার জন্যেই বোধ হয় এত আয়োজন।

মুনমুন বলল, এত খাবার—

ও কিছু না, নিন আরম্ভ করুন। কথাটা বলেই অশোকের দিকে তাকাল রুবী।

খেতে খেতে অশোক বলল, সত্যি অপূর্ব রান্না

রুবী বলল, শিল্পীদের এটাই বড় গুণ, সব কিছুই তাদের কাছে সুন্দর।

মুনমুন বলল, সুপই আমার প্রিয়।

মিসেস দত্ত বললেন, আর আমার মেয়ে হচ্ছে সুরের পাগল। এই যে একটু আগে আপনি গানটা গাইছিলেন সঙ্গে সঙ্গে ও টেপ করে নিয়েছে।

অশোক বলল, সর্নাশ। সেই জন্যেই পিয়ানোয়··

কথাটা শেষ হবার আগেই মিঃ দত্ত বললেন, পাশ্চাত্য আর

ভারতীয় রাগ-সংগীতের অপূর্ব সংমিশ্রণ।

মিসেস দত্ত সোহাগের ধমক দিয়ে স্বামীর দিকে তাকালেন। বললেন, কি লোক গো তুমি। ক্লান্ত হয়ে এসেছে শান্তিতে খেতে দেবে তো। কাল সকালে পিয়ানো নিয়ে ও সব কথা বললে চলবে না? যাও বাবা তোমার বিশ্রাম করগে।

সেই ভাল।

মুনমুন আর অশোক ওপরে গিয়ে কথা কাটাকাটি সুরু করল। তার ফাঁকেই মুনমুন জানলা দরজা বন্ধ করতে লাগল।

করছ কি। সব জানলা বন্ধ করলে দম বন্ধ হয়ে মরে যাব যে?

কিন্তু এ ছাড়া উপায় কি বল? শুনলে তো ন্যাকা মেয়ের কথা। উনি আবার বোর্ডারদের কথা টেপ করেন। কি ডেঞ্জারাস মেয়েরে বাবা।

তবে মেয়েটার পিয়ানোর হাত ভালই কি বল? কথাটা বলেই সিগারেটে শেষ টান দিয়ে, জ্বলন্ত টুকরো বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল অশোক।

মুনমুন বাথরুমে গিয়ে ঠাণ্ডা জলে প্রসাধনের প্রলেপ ধুয়ে টাওয়ালে মুখ মুছছে।

অশোক বলল, কলটা বন্ধ করে এলে না? জল পড়ে যাচ্ছে যে।

মুনমুন ভাবল হয়ত ভুলে গেছি। বেশ জোরে কলের মুখ বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু যেতে না যেতেই আবার কল দিয়ে হড় হড় করে জল পড়তে লাগল। কিন্তু কি আশ্চর্য কলঘরে অশোক ঢুকতেই জল পড়া বন্ধ হ'ল। ফিরে এসে শুতে গেল অশোক আবার কল দিয়ে জল পড়তে লাগল। এত আচ্ছা ফ্যাসাদ। বিরক্ত হয়ে মশারির দড়ি দিয়ে কলের মুখটা বেশ জোরে বাঁধল, ভাবল আর জল পড়বে না। এভাবে কয়েক ঘণ্টা চেষ্টা করেও যখন জল পড়া বন্ধ করতে পারল না, তখন ধরেই নিল এটা ভৌতিক কাণ্ড।

মুনমুন বলল, আমার আগেই মনে হয়েছিল এটা ভূতের বাড়ি।

সত্যি, আমিও আশ্চর্য হচ্ছি ব্যাপারটা দেখে। রাতটা কাটুক।

সকালে হোটেল মালিকের শ্রাদ্ধ করব

কথাটা শেষ হবার সাথে সাথেই লণ্ঠনটা দপ্ দপ্ করে জ্বলে নিভে গেল। আর তখনই ভয়ংকর অন্ধকারে সারা বাড়িটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পিয়ানোর সুর ছড়িয়ে পড়ল. সেই সুর এত করুণ, এত বিষাদের যে মুহূর্তে ওদের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। ওরা কান খাড়া করে আছে। আচমকা থেমে থেমে পিয়ানো বেজে যাচ্ছে। একসময় সেই মর্মস্পর্শী সুর ওদের আত্মাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা নিয়ে অশোক বলল, ঘুনঘুন ঘুমোলে?

ওরা কি আমাদের ঘুমোতে দেবে, যে ঘুমোব।

তা যা বলেছ।

এই ভাবে দুজনের কথার মাঝে আবার এক শ্বাসরুদ্ধকারী ঘটনা ঘটল। সারা বাড়ি কাঁপিয়ে আরম্ভ হ'ল নাচ। পিয়ানোর চড়া সুরে কারা নাচতে পারে? হোটেল মালিক তাঁর স্ত্রী বা মেয়ের কাজ নয়। যেই হ'ক এ বেয়াদপি আর সহ্য করা যাচ্ছে না। টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়ল দুজনে। ছায়া ছায়া অন্ধকারে মনে হচ্ছে কে যেন ওদের আকর্ষণ করছে। তবু ওরা অত্যন্ত সংযত ভাবে মনের ভয় চেপে হল-ঘরে ঢুকল। আর তখনই অনুভব করল একটা দুরন্ত ঝড়ো হাওয়া সব কিছু ছাপিয়ে হু হু করে জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এভাবে

কয়েক মিনিট চলার পর ঘরটা যদিও শান্ত হ'ল, তবু ওদের মনে হচ্ছে বরফের চাঁইয়ের উপর কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

বেশ একটা অস্বস্তি আর উৎকণ্ঠা নিয়ে ওরা অন্ধকারে প্যাসেজ পার হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। এবং আপাত দৃষ্টিতে কোন ভূত বা অন্য কিছু দেখতে না পেলেও অশোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল, এ সব ভূতের কাণ্ড ছাড়া কিছু নয়। মুনমুন কিন্তু অন্য কথা ভাবল। তার ধারণা এ সমস্ত কাণ্ড করছে হোটেল মালিকের মেয়ে। এ সবই টেপ রেকর্ড বাজিয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।

অশোক মুনমুনের কথা অস্বীকার করতে পারল না কিন্তু কল দিয়ে জল পড়া! এটা তো টেপের শব্দ নয়। কথাটা বলতেই আবার জল পড়তে লাগল। ওই শোন, আবার আরম্ভ হ'ল?

মুনমুন বলল, তুমি যাই বল এ সব ওই মেয়ের কারসাজি। খেতে বসে তোমার দিকে ড্যাব ড্যাব করে যখন তাকাচ্ছিল, তখনই আমার মনে হয়েছিল তোমাকে একা পেলে গিলে খাবে।

অশোক হেসে লঠল।

মুনমুন রেগে গিয়ে বলল, আর তুমিও ভীষণ হ্যাংলা, আইবুড়ো মেয়ে দেখলে—

কি বাজে বকছ, রহস্যটা উদঘাটন হলে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

এইভাবে অনিদ্রা অশান্তি আর উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না ওরা।

জানলায় তাকিয়ে দেখল ভোরের সমুদ্রে নুলিয়ারা নৌকো ভাসিয়েছে। সেই সাত-সকালেই মুখ হাত ধুয়ে চাপা ক্রোধ বুকে করে ঘর থেকে বেডিং নিয়ে বেরিয়ে এল অশোক আর মুনমুন।

ওদিকে রুবীর রাতটা অনিদ্রায় কাটল। গভীর রাত পর্যন্ত নাচ আর পিয়ানোর সুর রুবীকে মুগ্ধ করে রেখে ছিল। একবার ওপরে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল অশোক আর মুনমুনকে। কেমন করে ওরা বাজাচ্ছে আর নাচছে। তাই মাকে বলেছিল—মা একবার

ওপরে যাব।

না। ওরা এসেছে হনিমুন করতে ওখানে যেতে নেই মা।

সেই সদ্য রং করা স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে শুয়ে শুয়ে রুবী কি যেন ভাবছে। হঠাৎ সারা ঘরটা আতরের গন্ধে ভরে উঠল।

সেই গন্ধে রুবীর সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে গেল। আর তার সাথেই একটা ঘুমপাড়ানী সুর কানের মাঝে ভেসে এসে ওকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ভোরের আকাশে সূর্যের নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে। অশোক আর মুনমুন নিচে নেমে দেখল দিবাকর উনুনে কয়লা দিচ্ছে। ওরা ডাকল দিবাকরকে।

দিবাকর বোর্ডারদের হাতে জিনিসগুলো দেখে খুবই বিস্মিত হ'ল। বলল, আপনারা কি চলে যাচ্ছেন স্যার?

অশোক বলল, হ্যাঁ।

এতো সকালে কোথায় যাবেন?

সে খোঁজে তোমার কিছু দরকার আছে কি?

না, বলছিলাম—

থাক আর কিছু বলতে হবে না।

ওদের কথা শুনে মিঃ দত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, কোণারক যাবেন বুঝি?

যেখানেই যাই আপনার এখানে আর নয়।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না তো!

এতে না বোঝার কি আছে মশাই। এটা হোটেল না ভূতের বাড়ি!

কথা শুনে মিঃ দত্ত রেগে গিয়ে বললেন, থামুন। আপনাদের হোটেলে রাখাই ভুল হয়েছে। সারারাত বাজনার প্যানপ্যানানী—

আমারও তো তাই বলছি। যাক গে, আমরা চললুম।

ওরা চলে যেতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল মিঃ দত্তের।

রোজের মত সকালেই শ্যামলকে স্টেশনে যেতে হয়। সাইকেল নিয়ে বেরিয়েই শ্যামলের মনে হ'ল স্টেশনে যাবার আগে হোটেলে গিয়ে দেখে আসি গত রাতে যে যাত্রীকে রেখে এসেছি তারা কেমন আছে। কিন্তু রেণুকা ভবনের কাছে পাণ্ডা-ছড়িদারের সাথে অশোক আর মুনমুনকে কথা বলতে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে হাসি মুখে গিয়ে বলল, সানরাইজ দেখতে বেরিয়েছেন বুঝি? কাল কোন অসুবিধা হয় নি তো?

শ্যামলকে সামনে পেয়ে আহত শূয়োরের মত দাঁত খিঁচিয়ে উঠল অশোক। কাল রাতে পেলে আপনাকে গুলি করে মারতাম।

কথাটা শুনে বুলেটের মত ছিটকে সরে গেল শ্যামল। ভাবল নিশ্চয়ই রাতে কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে।

মুনমুন বলল, জেনে শুনে ভূতের হোটেলে রেখে ছিলেন কেন? সারা রাত আমরা ঘুমোতে পারি নি।

কেন? কি হয়েছিল?

পিয়ানোর প্যানপ্যানানী। উঃ, কি সব কাণ্ড!

অশোক বলল, স্টেশনে তো খুব বলে ছিলেন ব্লু-ভিউ হোটেল উঠে গেছে। ওটা কি? বলেই ব্লু-ভিউ হোটেলটা শ্যামলকে দেখাল। সকালে এখানেই ওরা এসে উঠেছে।

শ্যামল বলল, আমাদের হোটেলের বদনাম দেবেন না।

থামুন! ভূতের হোটেলের দালালী করে আবার বলা হচ্ছে, বদনাম দেবেন না। ব্লু-ভিউ হোটেলের ম্যানেজার সব কথা বলেছে।

বলেছে?

হ্যাঁ, বলেছে।

তা হলে এটাও জেনে রাখুন, ওদের হোটেলের মত আমাদের হোটেল থেকে কারো বৌ উধাও হয়ে যায় নি আজ পর্যন্ত।

মুনমুন অশোকের দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ গো, খবরের কাগজে গতমাসেই তো দেখেছি, রহস্যজনক ভাবে হোটেল থেকে মহিলা উধাও।'

হ্যাঁ। সে মহিলা ওখান থেকেই উধাও হয়েছে। এখন বুঝুন ব্যাপারটা কি?

শ্যামলের কথা শুনে চাপা উত্তেজনা প্রকাশ পেল মুনমুনের মনের কোণে। দরদর করে ঘামতে লাগল সে। ভাবল, আমিও যদি উধাও হয়ে যাই!

অশোক শ্যামলের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকাল।

শ্যামল বলল, তবে আর বলছি কি। কত স্বামীর যে ওদের হোটেল থেকে বৌ হারাল তা আর বলার নেই।

শুনছ, ভদ্রলোক কি বলছে! দরকার নেই পুরী বেড়াবার। চল বাড়ি ফিরে যাই কথাটা বলেই অশোকের দিকে তাকাল মুনমুন। তারপর শ্যামলের দিকে ফিরে বলল, কিছু মনে করবেন না। আজই চলে যাব আমরা।

সেই ভাল। ওরা সমুদ্রের দিকে চলে যেতেই আপন মনে হো হো করে হেসে উঠল শ্যামল।

ভৌতিক রহস্যের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে মিঃ দত্ত ওপরে গিয়ে ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছেন। শ্যামল অফিস ঘরে ঢুকে ভাবল মালিক বোধ হয় ঘুম থেকে এখনও উঠেন নি। একটু বসা যাক। হঠাৎ কে যেন ওর কাঁধে হাত রাখতেই শিউরে উঠল শ্যামল। ওর ভয় দেখে দিবাকর হেসে উঠল। দিবাকরের অদ্ভুত আচরণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শূন্য পেয়ালাটা ছুঁড়ে মারল শ্যামল। চীনা মাটির ভাঙা টুকরো লেগে পায়ের বুড়ো আঙুল কেটে রক্ত ঝরতে লাগল। অসম্ভব একটা যন্ত্রণা অনুভব করল এবং ঝুঁকে পড়ে আঙুলটা চেপে ধরল দিবাকর। এ দৃশ্য দেখে চোখের তারা কেঁপে উঠল শ্যামলের। এক মিনিট স্তব্ধ থেকে রুমাল দিয়ে ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিল তার। শ্যামলের হঠকারিতায় ও

নিজেই লজ্জিত। দিবাকর বেরিয়ে যেতেই মিঃ দত্ত ঘরে ঢুকে বললেন, রক্ত এল কোথা থেকে?

মালিকের কথায় ঘুরে দাঁড়াল দিবাকর। বলল, হোঁচট লেগে বুড়ো আঙুল কেটে গেছে। যান্ত্রিক স্বরের মতই দিবাকরের গলার স্বরটা শোনাল।

মিঃ দত্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, একটু দেখে চলবে তো? তারপর গম্ভীর হয়ে শ্যামলকে বলল, শুনেছ বোধ হয় বোর্ডার দুজন চলে গেছে?

হ্যাঁ, শুনেছি।

কিন্তু কি ব্যাপার! কোন তো অযত্ন করি নি।

ওদের ঘুম হয় নি।

কেন?

রাত ভোর পিয়ানোর বাজনা। আপনার মেয়ে মানে আমাদের দিদিমণির বাজনার চোটে পালিয়েছে।

কি বাজে কথা বলছ? রুবী পিয়ানো বাজায় নি। ওরাই বরং বাজনা বাজিয়ে সারা রাত জ্বালিয়েছে। প্রথম বোর্ডার না হলে ঘাড় ধরে বার করে দিতাম।

তাছাড়া সারা রাত হড় হড় করে জল পড়েছে।

সব শুনে এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন মিঃ দত্ত। অবিশ্বাস্য হলেও কিছু একটা ঘটেছে। কথাটা ভাবার সাথেই একটা জমকালো পুঞ্জীভূত শীতল বাতাস আঘাত করল জানলার কাচে। মুহূর্তে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে কাচের টুকরোয় ঘর ভরে গেল। ঘটনাটা এতো-দ্রুত এবং আকস্মিক ভাবে ঘটে গেল যে ওরা দুজনেই হতভম্ব হয়ে গেল। আর এই সময়ের মধ্যেই মিঃ দত্ত সিদ্ধান্ত নিলেন হোটেল বন্ধ করে দেবেন। যদিও তিনি ভূত বিশ্বাস করেন না, তবু বুঝতে পাচ্ছেন কিছু একটা অশুভ শক্তি বিপদের সংকেত দিয়ে যাচ্ছে।

ভয়ংকর কিছু একটা শোনার জন্য শ্যামল মিঃ দত্তের দিকে তাকাল। কিন্তু মিঃ দত্ত কোন কথাই বললেন না দেখে বেরিয়ে গেল সে।

…কিন্তু এটা কি ব্যাপার ? ব্যাপারটা যে কি তা মিঃ দত্তও বুঝতে পাচ্ছেন না। আর এই না বুঝতে পারার উদ্বেগে রক্তের চাপ বেড়ে যাচ্ছে তাঁর।

একটু পরে নিঃশব্দে ওপরে উঠে সেই পিয়ানোর সামনে গিয়ে অবাক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। ভাবলেন এটার জন্যই যখন যাত্রীরা চলে গেছে তখন এটাকেই আগে সরাতে হবে।

অন্যমনস্কভাবেই পিয়ানোর রিডে আঙুল রাখলেন মিঃ দত্ত। হঠাৎ মনে হ'ল অদ্ভুত একটা অদৃশ্য শক্তি যেন আঙুলের সূক্ষ্ম শিরায় সক্রিয় হয়ে হাতটা অসাড় করে দিচ্ছে। পরক্ষণেই সাঁড়াশি দিয়ে কব্জিতে কে যেন চাপ দিল। যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর টনটন করে উঠল। তারপর চিৎকার করে বললেন, হাত ছাড়। ছেড়ে দাও আমাকে। দূরে ছিটকে পড়ে যেতেই আঙুলগুলো মটমট করে স্বাভাবিক হ'ল। কিন্তু এই ভয়াবহ পরিস্থিতির পর বুকের মাঝে আতংকের ঝড় প্রচণ্ড বেগে বইতে লাগল। ভাবলেন এ অবস্থায় কি করা উচিত ? সামনে যখন কিছুই দেখতে পেলেন না, তখন চিন্তার গহ্বরে অন্ধের মত হাবুডুবু খেতে খেতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গিয়ে চেয়ারে বসলেন।

এর পরের ঘটনা আরো রহস্যময়। বাবাকে ঘরে বসে থাকতে দেখে রুবী চমকে উঠল। কারণ ও তো বাগানের চেয়ারে বসে বাবাকে চুরুট টানতে দেখেছে। এক সেকেণ্ডের মধ্যে একটা মানুষ কি ভাবে ঘরে আসতে পারে ? ব্যাপারটা কি ? তা হলে কি মনের ভুল ? হয়ত হবে।

মেয়ের পায়ের শব্দে মিঃ দত্তের মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কেটেছে। তাই মেয়েকে বলল, আমার চুরুট আর লাইটারটা দাও তো মা।

দিচ্ছি বাবা। বলেই খুঁজতে গিয়ে কোথাও পেল না। কোথায় রেখেছ বাবা ?

বালিশের পাশে।

ওখানে তো নেই। তুমি বোধ হয় বাগানে ফেলে এসেছ।

আমি ওপরে ছিলাম।

কি বলছ? একটু আগে বাগানে চেয়ারে বসে তোমাকে চুরুট টানতে দেখেছি। দিবাকরকে জিজ্ঞেস কর ও তো তোমাকে চা দিয়ে এল।

মেয়ের কথায় বিরক্ত হয়ে মিঃ দত্ত বললেন, কি বাজে বকছিস!

দিবাকর এগিয়ে এসে মিঃ দত্তকে বলল, আর এক কাপ চা দিয়ে যাব বাবু। তখন তো বললেন চা ভাল হয় নি।

রুবী বলল, দেখ তো দিবাকর, বাবার চুরুট আর লাইটার বাগানে আছে কি না!

বাগানেই আছে। নিয়ে আসব।

বলেই দিবাকর বাগান থেকে লাইটার আর চুরুট এনে মিঃ দত্তর হাতে তুলে দিল।

মিঃ দত্ত বিস্মিত হয়ে মেয়ে আর দিবাকরের দিকে তাকালেন।

চা আনি বাবু। কথাটা বলেই মালিকের দিকে তাকাতেই ভীষণ রেগে উঠল মিঃ দত্ত। সকাল থেকে ক'কাপ চা দিয়েছিস হতভাগা? মালিকের রূঢ় আচরণে থতমত খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দিবাকর। বুঝতে পারল না দোষটা কি।

রুবী চেয়ারে বসে বইয়ের পাতা উল্টোতে উল্টোতে বলল, তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ বাবা। এত ভুলো মন তোমার।

মিঃ দত্ত তার প্রিয় জিনিসগুলি এ ভাব পেয়ে বিস্ময়াভিভূত হয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, অসম্ভব! পরক্ষণেই বেশ অধৈর্য হয়ে চাপা উত্তেজনায় ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন।

তুমি কি আমার ওপর রাগ করলে বাবা?

না মা, না।

তবে?

সে তুই বুঝবি না। কথাটা শেষ হতেই জানলায় দাঁড়িয়ে শূন্য চেয়ারটা দেখতে লাগলেন আর তখনই দৃষ্টি যেন ধোঁয়াটে হয়ে যেতে লাগল মিঃ দত্তের।

মিসেস দত্ত ভাবলেন সকালে বোর্ডার চলে যাওয়ায় স্বামী বোধ হয়

বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন তাই সহানুভূতি মাখা গলায় বললেন, বোর্ডার গেছে ভালই হয়েছে, রাতে যা উৎপাত।

উঠে দাঁড়ালেন মিঃ দত্ত। স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলব তাতে যদি তোমার মনে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, আমাকে যেন ভুল বুঝ না।

স্বামীর অদ্ভুত কথার ধরণ দেখে কৌতুহলের ঝিলিক ছড়িয়ে পড়ল মিসেস দত্তের চোখে মুখে। বল কি বলবে?

আমি কি তোমার স্বামী রসিক দত্ত না অন্য কোন লোক? একবার ভাল করে দেখত।

স্বামীর কথায় হাসি চেপে মিসেস দত্ত বললেন, বিয়ের পর থেকে যে রস তোমার মধ্যে দেখেছি, তাতে বে-রসিক দত্ত বলি কি করে— অতএব নিশ্চয়ই রসিক দত্ত।

রসিক দত্ত! তা হলে তোমার মেয়ে আর হোটেলের ঠাকুর বাগানে যাকে দেখল সেটি কে? সেটিও কি তোমার স্বামী?

বাঃ, চমৎকার। রুবী একবার এদিকে আয়। এক্ষুণি একবার ডাঃ অগ্নীশ্বর মুখুজ্যেকে খবর দে। তোর বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

মিঃ দত্ত রেগে গেলেন স্ত্রীর কথায়। বললেন, তোমার ঠাকুর কাকে চা দিয়ে বলছে বাবু চা আনব। এ সব কথার অর্থ কি?

সকাল থেকে চা পাও নি। ওঃ, তাই তোমার মেজাজ তিরিক্ষি। তাই আবোল তাবোল বকছ। তারপর মেয়েকে সামনে পেয়েই তার উপর ঝাল ঝাড়লেন মিসেস দত্ত।

বলি, তুই ও তো তোর বাবাকে এক কাপ চা করে দিতে পারতিস।

রুবী বলল, বাবাকে বাগানে চা খেতে দেখেছি।

বাজে বকিস না।

দিবাকর এসে বলল, না মা, আমি নিজে বাবুকে বাগানে চা দিয়ে এসেছি।

মিসেস দত্ত বুঝলেন, পুরো ব্যাপারটাই গোলমেলে। নিশ্চয়ই

কেউ রসিক দত্ত সেজে চা খেয়ে গেছে।

রুবী আর দিবাকর চলে যেতেই মিঃ দত্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমায় বেয়াদপ মেয়ে আর বাচাল ঠাকুরের কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি মরে গেছি, তুমিও নিশ্চয়ই ওদের কথা বিশ্বাস করলে ?

মিঃ দত্তের কথা শুনে ভয়াল দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে মিসেস দত্ত বললেন, আমার কথাটা ভেবেছ। সে যদি দেখা দেয়, আমি কি করে চিনব তোমাকে ?

স্ত্রীর কথা শুনে বিদ্রূপের স্বরে মিঃ দত্ত বলল, আমি আমার কথাই ভাবছি।

সোনার দোকানে বসে আছে নলিন। দোকানদার মোহরটা দেখে সস্তায় দাঁও মারতে চাইল। দোকানীর ছল চাতুরির ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মোহরটা পকেটে করে আঠারনালার পথ ধরল। ভাবল দেলাংয়ে পিসির বাড়িতে দিনকতক কাটিয়ে সময় সুবিধামত মোহর বিক্রি করে বাড়ি ফিরলেই চলবে। সারা দিন মাঠে ঘাটে কাটিয়ে সন্ধ্যায় ঢুকল পিসির বাড়িতে। ওর পিসে কেলু মল্লিক উঠনে বসে সরষে কুড়োচ্ছিল হঠাৎ নলিনকে দেখে খুশি হল। এসেছিস বাপ আয়'আয়। ধরতো একবার সরষের বস্তাটা। ঘরে তুলে রাখি।

কেলু মল্লিকের সুখের সংসার। কিন্তু তার সংসারে কেউ এসে পাত পাতবে এ তাঁর কাছে অসহ্য। তবু আত্মীয় বন্ধু কেউ এলে যদি দেখে খেতে দিতে হবে, তা হলে যতক্ষণ থাকবে তাকে খাটিয়ে নেবে। কাজেই ঘরে পা দিতে না দিতেই আধ ঘণ্টা ফাই ফরমাস খাটতে হল নলিনকে। পিসি গেছল সাক্ষীগোপল। ঘরে ঢুকেই নলিনকে দেখে বলল, কখন এলি রে নলিন ? সব ভাল তো ?

হ্যাঁ পিসি।

তা থাকবি তো দিন কতক ? না কালই পালাবি ?

থাকব দু-চার দিন।

তা বেশ। আয় খেয়ে নিবি।

সেই সাত সন্ধেতেই নলিন দুধ চিড়ে গুড় আর এক ঘটি জল খেয়ে খাটিয়ার শুয়ে পড়ল। সারা দিনের ক্লান্তি আর অবসাদ ওকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কিন্তু মাঝে রাতে ঘুমটা হঠাৎ ভেংগে গেল। আর তখনই তার মনে হল, সেই মোহরটা থেকে আগুন বেরিয়ে ওকে যেন দগ্ধ করছে। পকেট থেকে মোহরটা বার করে নলিন দেখল, সত্যি একটা তেজস্কর রশ্মির উত্তাপে তার দেহ থেকে এক ধরনের অাঁঠাল ঘাম বেরিয়ে তাকে তুলোর মত হাল্কা করে দিচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পারলেও একটা জিনিস অনুমান করতে পাচ্ছে, যা কিছু ঘটছে সবই ভৌতিক মোহরটাকে কেন্দ্র করে।

দেখতে দেখতে একটা অজানা শক্তি ওর সমস্ত ইচ্ছা শক্তিকে আত্মসাৎ করে ফেলল। নলিন খাট থেকে উঠে দাঁড়াতে গেল ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা উড়ন্ত কংকাল পাখি আকাশের বুকে সোঁ সোঁ শব্দ করে উড়ে এল নলিনের কাছে এবং কিছু বোঝার সুযোগ না দিয়েই ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল নলিনকে।

নলিন নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল মাটি থেকে অনেক উপরে উঠে গেছে। শহরের আলোগুলো জোনাকীর মত দেখাচ্ছে। ভয়ে আতংকে শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে নলিনের।

কয়েক ঘণ্টা ধরে বহু জনপদ শস্যক্ষেত্র মাঠ ঘাট পাহাড় পর্বত নদনদী বনভূমির উপর দিয়ে কংকাল পাখিটা উড়তে উড়তে এক সময় ধূসর মরুভূমির মাঝে একটা রুক্ষ পর্বতের পাদদেশে নেমে ডানা ঝাপটা দিয়ে উঠল। তারপর নলিনকে ঠোঁট থেকে নামিয়ে কর্কশ চিৎকার করে মরুভূমি কাঁপিয়ে তুলল কংকাল পাখিটা। তার চিৎকারে ছুটে এল কতকগুলো মরু শৃগাল। তাদের নিঃশ্বাসের হিস্‌হিস্‌ শব্দ আর আগুন ঝরা দৃষ্টির সাথে কালো লিকলিকে জিভ দেখে নলিন ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। পরক্ষণেই কাদের স্পর্শে শরীর রোমাঞ্চ হতেই তাকিয়ে দেখল, তিনটি নারী মূর্তি অটুট বলিষ্ঠ যৌবন নিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

নলিন ওদের পোসাক পরিচ্ছদ দেখে বুঝল খুব সম্ভব কাফ্রি রমণী। নিজেদের মধ্যে দুর্বধ্য ভাষার কি যেন নলিনকে বলল, কিন্তু নলিনের কাছ থেকে কোন উত্তর না পাওয়ায় টানতে টানতে অন্ধকার গুহার মধ্যে তাকে তারা নিয়ে গেল। তখনই কংকাল পাখি আর মরু শৃগালের চিৎকারে নীরব মরুভূমি ভয়ংকর হয়ে উঠল।

রমণী তিনজন নলিনকে গুহার মধ্যে রেখে সরে যেতেই নলিন দেখল দৈর্ঘে প্রস্থে প্রশস্ত এ গুহায় জনাপাঁচেক মানুষ স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে। কে যেন প্রদীপের শিখা বাড়িয়ে দিল। ফলে নজর পড়ল এক নিরাভরণ রমণীর উপর। স্তন্যপানরত একটি শিশুকে কোল নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে রমণীটি। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বার বার ইঙ্গিতে শিশুকে দেখাতে লাগল সে।

কিন্তু নলিনের নীরবতায় ডুকরে কেঁদে উঠল রমণী। তারপর কেমন যেন ভয়ংকর হয়ে উঠল তার চেহারা।

এদিকে অনাবশ্যক হয়রানির জন্য নলিনের মনেও চাপা ক্রোধ দেখে রমণী শিশুকে পাথরের উপর শুয়েই দিয়ে প্রচণ্ড ঘৃণার নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে এল তার দিকে।

সেই তিনজন কাফ্রি রমণী আড়াল থেকে দেখছিল ঘটনাগুলো কিন্তু যখন ভাবল নলিনকে উলঙ্গ রমণীটি ছিঁড়ে খাবে, তখন ছুটে এসে তারা অন্য গুহায় সরিয়ে নিয়ে গেল তাকে।

পাতলা কুয়াশার আচ্ছাদনে ঢাকা এ গুহাটিকে নলিনের খুবই চেনা চেনা মনে হচ্ছে। এখানেও প্রদীপ জ্বলছে। কাফ্রি রমণী তিনজন চলে যেতেই নলিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল নির্মল আকাশে কালো মেঘের মত একরাশ কুঞ্চিত কেশে মুখ ঢেকে পাথরে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে একটি সোনালী মেয়ে। নলিন মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিন বার টোকা দিল। ঘুম ভেংগে গেল তার, তাকাল ওর দিকে। আর তখনই নলিন লক্ষ্য করল মেয়েটির সুদীর্ঘ ঘন কালো চোখের মণি দুটো অদ্ভুত নীল। উদ্ধত যৌবনে যেন সম্মোহনী শক্তির মায়াজাল ছড়ান।

সে মায়াজালকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা কোন পুরুষের নেই। নলিনকে দেখে কিন্তু কোন চিত্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না রমণীর, শুধু গভীর সমুদ্রের থেকেও শান্ত নীল চোখে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। নলিন ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে রমণীর কাছে বসে তার রেশমের মত নরম চুলগুলি মুখের পাশ থেকে সরিয়ে দিতে লাগল। হঠাৎ রমণীর নিষ্পলক দৃষ্টি আর ভাবলেশহীন মুখের চেহারায় বিষাদের ছায়া দেখে চমকে উঠল নলিন। এ কি! মনে হচ্ছে কবরের তলা থেকে সদ্য উঠিয়ে আনা হয়েছে রমণীকে। এ তো মৃত!

নিঃশব্দে সরে যেতে চাইল নলিন, আর তখনই গম্ভীর অথচ সুমধুর স্বরে মৃত রমনী বলে উঠল, আমি কিছু বলতে চাই।

নলিন ঝুঁকে পড়ল রমণীর মুখের উপর। মৃত রমণী দুহাতে নলিনকে স্পর্শ করে বলল, কত যুগ পর এলে। এখনই চলে যাবে?

আপনার কথা ঠিক বুঝাত পারছি না। কে আপনি?

নলিনের কথা শুনে মৃদু হাসল রমণী। তারপর তার করতল চুম্বন করতেই মরুগুহার স্বপ্ন লোকের চাবি খুলে গেল।

নলিন দেখল আর এক চিত্র। পূর্ব জন্মে যা ছিল। হ্যাঁ আমিই তো সেই সুবুদ্ধি বনিকের জামাতা শঙ্খেশ্বর বনিক। সব কিছু চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে উঠছে। ঘর দোর স্ত্রী পুত্র এবং এই সেই প্রিয় শালিকা। যার দেহের উত্তাপ এই মুহূর্তে অনুভব করছে। বহু যুগ পর প্রিয় শালিকাকে কাছে পেয়ে নলিন তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে আবেগে বলে উঠল, মোমাম—মোমাম এতদিন কোথায় ছিলে? আমি জানি, তোমার দিদি 'রোমাম' আমাদের দুজনকেই মেরে ফেলতে চাইছে।

আমি তোমাকে অনেক দূরে নিয়ে যাব।

কথা শুনে কোমল বক্ষে নলিনকে জড়িয়ে ধরল রমণীটি। ভালবাসার চুম্বনে ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠল দুজনের ঠোঁট। তারই মাঝে মোমাম বলল, চল, এই মুহূর্তেই এখান থেকে চলে যাই।

উঠে দাঁড়াতে গেল নলিন। মোমামের হাত ধরে বেরিয়ে যেতে চাইল। তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ রোমাম ঝড়ের বেগে ছুটে এসে নলিনের পিঠে কি যেন একটা বিদ্ধ করে দিল। আর্ত চিৎকারে সে ঢলে পড়ল। রোমাম আর মোমামের মধ্যে বেঁধে গেল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, আর সেই সুযোগে কংকাল পাখি আবার নলিনকে ঠোঁটে করে উড়তে লাগল আকাশে।

তারপর রাত্রির শেষ প্রহরে পুরীর স্বর্গদ্বারের মোড়ে ধুপ করে নলিনকে ফেলে দিয়ে কংকাল পাখি অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাখির ডানার সোঁ সোঁ শব্দ আর নলিনের পতনের শব্দে পান-গুমটির মালিকের ঘুম ভেংগে গেল। ছিঁচকে চোরের ভয়ে বংশীচরণ গুমটিতেই শুয়ে থাকে। ভাবল কেউ বোধ হয় গুমটি ভাংগছে। কুপি জ্বালিয়ে গুমটির ফাঁক দিয়ে দেখল নলিনবাবু মাটিতে পড়ে কাৎরাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে নলিনকে অনন্তশয্যা মন্দিরের বারান্দায় উঠিয়ে নিয়ে গেল।

বংশীচরণ কুপির আলোয় দেখল নলিনের পিঠে কি যেন একটা বিঁধে আছে। আস্তে অস্তে তীরের ফলার মত তীক্ষ্ণ মরু শৃগালের নখটা টেনে বার করতেই বেশ খানিকটা তাজা রক্ত নলিনের পিঠ থেকে বেরিয়ে এল। নিজের গামছা দিয়ে ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিতেই রক্ত বন্ধ হ'ল। তবু নলিন কথা বলছে না দেখে ভীষণ চিন্তায় পড়ল বংশী। কে যেন কালী নাম করতে করতে দূরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। বংশী ডাকল, কে যায়?

আমি বিষ্টু মোড়ল।

ব্যানার্জী বাস কোম্পানীর ম্যানেজার বিষ্টু মোড়লের কণ্ঠস্বর বংশীকে সাহস জোগাল। বলল, একবারটি এ দিকে আসতে হবে যে?

কেন ? কি আবার হ'ল ?

নলিনবাবুর পিঠে কে যেন তীর মেরেছে !

কথাটা শুনেই ছুটে এল বিষ্টু মোড়ল। প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেও কি ভাবে নলিনের জ্ঞান ফেরান যায় চিন্তা করতে লাগল। তখনই তার মনে পড়ে গেল নাকের কাছে চামড়া ধরলেই তো জ্ঞান ফিরে আসবে কিন্তু এমনই কপাল দুজনেরই হাওয়াই চপ্পল। অগত্যা মুচিদের দোকানের কাছে মোড়ল চামড়ার টুকরো খুঁজতে লাগল। আর তখনই ভজন এসে পিছন থেকে ওর ঘাড়টা ধরে বলে উঠল, আমার মোহর ? আমার মোহর নিয়ে পালিয়ে যাবি নলিন। তোর সাহস তো কম নয় !

বিষ্টু মোড়ল কাৎ হয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমি নলিন নই ভজনবাবু, আমি বিষ্টু মোড়ল। নলিনের জ্ঞান ফেরাবার জন্য চামড়া খুঁজছি।

নলিনের নামটা শোনা মাত্র তীব্র দুঃসহ ব্যথার পুঞ্জ পুঞ্জ কালোমেঘ জমে উঠল ভজনের অন্তরে।

দেহের পেশীগুলো শক্ত হয়ে নিষ্ঠুর করে তুলছে তাকে। ভাবছে সুড়ংগের বিসর্পিল সরু অন্ধকার গুহায় মৃত্যু ছিল অবধারিত। সে মৃত্যুকে জয় করে যে মোহর আমি পেয়েছি, নলিন তা চুরি করেছে। এখন তাকে যখন কাছে পেয়েছি তখন কিছুতেই ছাড়ব না। সঙ্গে সঙ্গে অনন্তশয্যা মন্দিরে ছুটে এল ভজন। বেশ উত্তেজিত হয়ে খুঁজতে লাগল নলিনকে কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেল না।

বিষ্টু মোড়ল বিস্মিত হয়ে ভজনের দিকে তাকিয়ে বলল, ওরা গেল কোথায় ?

বেশ কয়েকবার বংশীর নাম ধরে ডাকল বিষ্টু মোড়ল। কোন উত্তর নেই। এ কি ! কোথায় গেল ওরা ! এ যে দেখছি ভৌতিক কাণ্ড।

বিষ্টুর হাবভাব দেখে রেগে গেল ভজন। বলল, আমার সাথে কালোয়াতী করে পার পাবে ভেবেছ ?

বিষ্টু মোড়ল গর্জে উঠল, আপনার ওই লাল চোখকে বিষ্টু মোড়ল

ভয় পায় না। বন্ধুর পিঠে ছোরা বসিয়ে পার পাবেন ভেবেছেন। দেখতে পাচ্ছেন না রক্তের দাগ?

এত রক্ত এল কি করে। তা হলে কি সত্যি নলিনকে কেউ ছোরা মেরেছে? নীরব বিস্ময়ে ভজন তাকিয়ে আছে চাপ চাপ রক্তের দিকে।

এ নীরবতায় বিষ্টু মোড়ল ভাবল নিশ্চয়ই ও নলিনকে ছোরা মেরেছে। বলল, নলিনকে আঘাত করলেন কেন?

আমি আঘাত করি নি। কিন্তু গেল কোথায় ওরা?

নিশ্চয়ই থানায় গেছে। আপনি চলে যান, নইলে এইখানে পুলিশ আপনাকে দেখলে অন্তত এটুকু বুঝতে পারবে, কাজটা কার?

মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল ভজনের। ভাবল নলিনকে ছোরা মেরে নিশ্চয়ই কেউ মোহর নিয়ে পালিয়েছে। চিন্তা রহস্যে হাবুডুবু খেতে খেতে নিঃশব্দে চলে গেল সে।

একটু পরেই কার যেন খস্‌খস্ পায়ের আওয়াজে বিষ্টু মোড়ল পিছনে তাকাল। দেখল বংশী এদিকে আসছে। তাকে দেখে বলল, কি ব্যাপার কোথায় গেছলি বংশী?

বিনায়কবাবুর বাড়িতে নলিনবাবুকে রেখে এলাম। আপনি যেতেই ওর জ্ঞান ফিরল। বলল, আমাকে বিনায়কের কাছে নিয়ে চল।

ভালই করেছ। সকালে মন্দিরের চাতালটা ধুয়ে দিও। চলি কেমন। বিষ্টুপদ চলে যেতেই বংশী আবার পানগুমটিতে ঢুকল।

বিনায়ক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে নলিনের দিকে। বংশী এক নিঃশ্বাসে কি যে বলে গেল ঠিক বুঝল না বিনায়ক। তাই নলিনের পিঠের ক্ষতস্থানটা দেখে অনুমান করল এটা ছোরার আঘাত। বিনায়ক বলল, কে তোকে ছোরা মেরেছে? নিশ্চয়ই ভজনের কাজ?

না।

তবে কি করে এমন হ'ল?

তুই কি আমার কথা বিশ্বাস করবি? বলেই সমস্ত ঘটনাটা

বিনায়কের কাছে নলিন বলল।

সমস্ত ঘটনা শুনে যদিও বিনায়ক বিস্মিত হ'ল তবু বলল, আমার জীবনেও তো এরকম অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে। সেই নরকের অন্ধকার থেকে প্রেত-রমণীর একগুচ্ছ কেশ আমি এনেছিলাম, যা আমার কাছে আছে।

নলিন মরু শৃগালের নখটা দেখিয়ে বিনায়ককে বলল, এই দেখ, এই জিনিসটা সেই নারী আমার পিঠে বিঁধিয়ে দিয়ে ছিল।

বিনায়ক মরু শৃগালের নখ কখনও দেখে নি, তাই ঠিক বুঝতে পারল না এটা কিসের নখ।

এখন বল, সেই মোহরটা কোথায়—কথাটা বলল বিনায়ক।

নলিন পকেট থেকে মোহরটা বার করে বিনায়কের হাতে দিতেই বিনায়ক আনন্দে বলে উঠল, এ মোহর আরও আছে নিশ্চয়ই?

অনেক আছে। কিন্তু ভূতের মোহর না নেওয়াই ভাল।

নলিনের কথা শুনে হেসে উঠল বিনায়ক। বলল, তুই একটি আস্ত গাধা। গুপ্ত মোহরের সন্ধান পেয়ে কেউ কি চুপ করে থাকে? বিশেষ করে সেটা যখন আমার বাড়িতেই।

বিনায়কের ভাব দেখে বিস্ফারিত চোখে তাকাল নলিন। বলল, ও সর্বনেশে মোহরের দিকে হাত দিস না।

আমাকে ভয় দেখিয়ে তুই কি ভজনকে বড়লোক করতে চাস? ভজন নিশ্চয়ই চুপ করে থাকবে না। কথার মাঝেই নলিন বলল, আমার পিঠে ভীষণ যন্ত্রণা করছে। নলিনের কথা শুনে বিচলিত হয়ে পড়ল বিনায়ক। কিন্তু ওষুধ ডাক্তার এখন কিছুই পাওয়া যাবে না, কাজেই খানিকটা ব্রাণ্ডি খাইয়ে দিল নলিনকে। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল নলিন। বিনায়ক সেই মরু শৃগালের নখটা আর মোহর পকেটে নিয়ে অন্য ঘরে গেল।

রাত শেষ হয়ে এসেছে তবু যেন বিনায়কের অসহ্য লাগছে প্রতিটি মুহূর্তে। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত মনটা ছটফট করছে, তাই হাত দুটো পিছনে মুষ্টিবদ্ধ করে পায়চারি করতে করতে বার বার ঘড়ি দেখছে।

পাঁচটা বেজে গেছে। ভাবল এখন গেলে ভজনকে পাকড়াও করতে পারব। মোহরের সন্ধান ভজন জানে কাজেই তার কাছ থেকেই সব জানতে হবে। না আর দেরী নয়।

ভোরের আলোয় ভজনের বাড়ির পথ ধরল বিনায়ক। শংকর মঠ বাঁ হাতে রেখে সতাসন রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গৌড়ীয় মঠের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ একটা উন্মত্ত ঝড় ওকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল পরিত্যক্ত সমাধিগুলোর দিকে। বালু-ঝড়ে চোখের তারা দুটো ঢেকে গেল বিনায়কের। ধাক্কা খেলো সমাধির পাথরে। তাকাতে গিয়ে চোখ দুটো খচ্ খচ্ করে উঠল। হাত দিয়ে চোখ দুটো ঘসতে ঘসতে বেশ উত্তপ্ত লাল হয়ে জল গড়াতে লাগল তার। বেশ একটা যন্ত্রণা অনুভব করে কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছল আর তখনই তার মনে হল মুখটা বিকৃত করে কাউকে যেন সে ভেংচি কাটছে। মাত্র মিনিট তিনেকের মধ্যেই দুঃসহ মুহূর্ত কেটে গেল, কিন্তু রেখে গেল একটা অসহ্য যন্ত্রণা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভজনের বাড়ির সামনে গিয়ে নাম ধরে ডাকতেই জানলায় মুখ বাড়িয়ে ওর কাকা বলল, কে হে?

আমি বিনায়ক।

কি ব্যাপার? এত ভোরে?

ভজনের সাথে বিশেষ দরকার আছে।

ও তো রাতে বাড়ি আসে নি। আমি তো ভাবলাম তোদের বাড়িতেই আছে। কোথায় গেল বল দেখি?

তাই তো ভাবছি। যাক গে, দেখছি কোথায় আছে।

অন্য পথ ধরল বিনায়ক. ভাবল শম্ভুর দোকানের চা খেয়েই বাড়ি যাব।

পথের পাশেই একটা বিরাট থামওয়ালা বাড়ির বারান্দায় কবিরাজ হেমাংগ চাটুজ্যেকে দেখে, কাছে এগিয়ে গেল বিনায়ক।

একটা নড়বড়ে খাটের সামনের দিকে হাত ঝুলিয়ে মাথাটা বুকের কাছে রেখে হেমাংগ কবিরাজ জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। হাঁপানির

টানটা ভীষণ বেড়েছে, কথা বলতে পারছে না, তবু উদাস দৃষ্টিতে বিনায়কের দিকে একবার তাকাল।

আপনার কি ভীষণ কষ্ট হচ্ছে? বিনায়ক কথাটা বলল।

বিনায়কের কথার উত্তরে ঘাড় নেড়ে জানাল কবিরাজ। তারপর আপন মনেই বলল, কবে যে যাব।

কবিরাজকে দেখলেই বোঝা যায় জগৎ সম্বন্ধে সে উদাসীন। দেওয়া নেওয়ার তার কিছু নেই।

কিছু কি বলবে বাবা?

হ্যাঁ, এটা কি জিনিস দেখুন তো কাকা আপনি কবিরাজ। অনেক কিছু জানেন তাই, বলেই মরু শৃগালের নখটা কবিরাজকে দেখাল বিনায়ক।

নখটা দেখেই চমকে উঠল কবিরাজ। হৃদপিণ্ড ধকধক করে উঠল তার। একটা ভীতিপ্রদ দৃষ্টি নিয়ে বিস্ময়ে বিনায়কের দিকে তাকিয়ে বলল, এটা কোথায় পেলে? এ যে মরু শৃগালের নখ।

ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না আপনার কথা।

না বোঝাই ভাল।

কেন বলুন তো?

তবে শোন, এটা দিয়ে মরা মানুষও বাঁচান যায়, আবার এটাই

মানুষের মৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কবিরাজের কথায় যতটা বিস্মিত হ'ল তার থেকেও বেশি ভয় হল বিনায়কের। বলল, এটা কি আপনার কাজে লাগবে?

এটা তুমি দেবে? পেলে তো বেঁচে যাই বাবা।

ঠিক আছে, রাখুন আপনি।

বিনায়ক চলে গেল। কবিরাজ একবারও তাকাল না বিনায়কের দিকে, কারণ এই মহার্ঘ বস্তুটি পেয়ে সে এত তন্ময় হয়ে গেছল যে অন্য কিছু দেখার সময় ছিল না।

শম্ভু বোসের চায়ের দোকানে ভন্‌ভন্‌ করে মাছি উড়ছে। একটা ভ্যাপসা গন্ধ লাগল বিনায়কের নাকে। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ফস্‌ করে দেশলাইটা জ্বালল। তারপর জোরে সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, অসহ্য যন্ত্রণা। কপালের রগ দুটো ভীষণ টন্‌টন্‌ করছে।

কি হ'ল রে বিনা?

মাথায় একটা অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

তা এত সকালে কোথায় গেছলি?

ভজনকে খুঁজতে? তুই জানিস কোথায় আছে?

না। কাল থেকে দেখি নি।

উঠে দাঁড়াল বিনায়ক। মনে হচ্ছে সেই ভৌতিক মোহরটাই যন্ত্রণা দিয়ে ওর হৃদপিণ্ড স্তব্ধ করে দিতে চাইছে।

ভজনের খবর পেলে জানাবি। নিজের কথাটা যেন নিজের কানেই বেয়াড়া শোনাল বিনায়কের। সে চলে গেল।

দৃশ্যটা খুবই করুণ, দুঃখজনক। নুলিয়াপাড়ার ঘরে দুর্গন্ধ নোংরা বিছানাতেই রাতটা কেটেছে ভজনের। সকালে ঘুম ভাংগতেই নটবর নুলিয়াকে ডেকে পাঠাল নলিনের খবর জানতে এবং পুলিশ ওকে খুঁজছে কিনা দেখে আসতে। দুটো টাকা দিতেই নটবর চলে গেল। দাওয়ায় বসে সমুদ্রের দিকে তাকাল ভজন। আর তখনই মনে হ'ল

সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন তার কাছে বীভৎস হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের উপর আকাশটা ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে। কতকগুলো কাক মরা ইঁদুর নিয়ে কাড়াকাড়ি করে কর্কশ চিৎকার করছে। বিশ্রী মুখভঙ্গি করে হেট্ হেট্ শব্দে হাততালি দিল ভজন। একটু পরে নটবর ফিরে এসে বলল, নলিন ঘুমোচ্ছে। পাড়ার পরিস্থিতি স্বাভাবিক। পুলিশ তাকে খোঁজ করে নি। খুব আশ্চর্য হল ভজন। সবই যেন রহস্য হয়ে উঠল তার কাছে। চিন্তাগুলো ওলটপালট হতেই জন্তুর মত একলাফে দাওয়া থেকে নেমে হন্‌হন্ করে বাড়ির পথে চলল সে।

সী-বীচের কাছে বিনায়ক ভজনকে দেখতে পেয়ে ডাকল। বিনায়কে দেখে প্রাণহীন মৃতের মত থমকে গেল ভজন।

বিনায়ক কাছে গিয়ে বলল, তোর কি বিবেক বুদ্ধি বলে কিছু নেই? কোথায় গেছলি? তোর কাকা খুঁজতে বেরিয়েছে।

তুই কি করে জানলি? তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বর ভজনের কণ্ঠে।

আমি সব জানি। গম্ভীর হয়ে গেল বিনায়ক।

ভজন বলল, কাল কেউ মরে নি? কারো মরার খবর জানিস!

মরে নি, তবে মরবে দু এক দিনের মধ্যে।

কথা বলতে বলতে ভূত-কুঠির কাছে এসে ভজন বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই বিনায়ক পথরোধ করে বলল, মোহরগুলো কি একাই নিবি?

মোহর! কোথায় মোহর! কে তোকে বলেছে মোহরের কথা?

আমাকে গোপন করার চেষ্টা করবি না। ফল ভাল হবে না।

যা-যা ওসব ভয় নলিনকে দেখাবি। কি করবি তুই আমার?

দেখবি কি করব? এক ঘুঁষিতে—

কথাটা শেষ হতে না হতেই দুজনে জোর হাতাহাতি হয়ে গেল। শেষে দুজনে দুজনকে মুখ খিস্তি করেতে করতে দুদিকে চলে গেল।

এই মর্মান্তিক দৃশ্যটা দুজনের স্মৃতিপটেই জেগে উঠে, দুজনকেই

উত্তেজিত করে রেখেছে। বিনায়ক অস্বাভাবিক হয়ে ভাবছে, যে কোন মূল্যে মোহর তার চাই।

আর রাগটা কমতেই ভজন একটা নতুন জীবন খুঁজতে লাগল। যে জীবনে দুঃখ নেই, অনিদ্রা নেই, অশান্তি নেই।

বাড়িতে গিয়ে ভাবল না আর নয়, অতীতের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে নিজের মধ্যেই নিজেকে খুঁজতে হবে। ও মোহর হয়ত মৃত্যুর কারণ হত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওই মোহরই আমাকে নতুন জীবন দিল। সত্যের পথেই জীবনটা এগিয়ে দিয়ে যেতে চাইল ভজন। ত্যাগ করল মোহরের লোভ। অন্যদিকে প্রচণ্ড লোভী হিংস্র হয়ে উঠল বিনায়ক।

তখন সূর্যের বিদায় নেবার পালা। সমুদ্রের ভেজা বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ ভেসে আসছে। বালুতটে তাকিয়ে নলিন দেখল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য উঁকি দিয়ে গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। শেষ মুহূর্তে সূর্যটা গাঢ় লাল বর্ণ হয়ে গেল। ঠিক যেন সিঁদুরের টিপ। তারপর আস্তে আস্তে মানুষের মনকে উদাস করে সাগরের বুকে নেমে এল অন্তহীন গভীর আঁধার। সে আঁধারের সাথে আমরা পরিচিত। তবু এই মুহূর্তে তাকে খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হ'ল নলিনের। অনেকগুলো এলোমেলো চিন্তা মাথায় নিয়ে সী-বীচ থেকে হোটেলে এসে ঢুকল সে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনতে পেল মিঃ আর মিসেস দত্তের বাকবিতণ্ডা। বেশ উত্তেজিত ভাবেই কথা কাটাকাটি চলছে। নলিন ভাবল এ অবস্থায় ভেতরে যাওয়া সমীচীন নয়। কিন্তু কাচের পাল্লায় নলিনের ছায়া দেখে মিঃ দত্ত বললেন, কে? কে ওখানে?

আমি নলিন।

তা বাইরে কেন?

মাথাটা ঈষৎ নিচু করে পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল নলিন। রুবী ওর গলার আওয়াজ পেয়ে জানলায় হাত রেখে দাঁড়াল। বার কয়েক বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, কি বোকা···বলেই নিজেই সে

লজ্জিত হ'ল। নলিন মাথা নিচু করে রাগে ফুঁসছে।

মিঃ দত্ত বললেন, তোমার পিঠের ঘা'টা কেমন আছে?

ভাল। কথাটা বলেই রুবীর দিকে তাকিয়ে দেখল অদ্ভুত একটা চঞ্চলতায় মার কাছে সরে এসে নরম তুলতুলে আঙুল দিয়ে শাড়ির আঁচলটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলছে আমি সমুদ্রের ধারে যাব মা?

না। একা যাবে না তুমি তো জান না সমুদ্রের ধারে স্থানীয় ভূতের কি উৎপাত।

তাহলে তুমি আমার সঙ্গে চল।

মিঃ দত্ত বললেন, তাই যাও না। একা একা হোটেলে থেকে মেয়েটা হাঁপিয়ে উঠেছে।

তা তুমিও তো নিয়ে যেতে পার। মিসেস দত্ত কথাটা বলেই নলিনের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কি কোন কাজ আছে বাবা নলিন?

না।

তা হলে যাও না একবার রুবীর সাথে বেড়িয়ে এস।

রুবী অন্তরে খুশি হলেও মুখে বলল, আবার একটা ভূত। মা, আমি একাই যেতে পারব।

শুনছ মেয়ের কথা। স্ত্রী স্বামীর দিকে তাকাল।

গরম চপের গন্ধটা ভাল লাগছে নলিনের। ভাবছে চপ যখন ভাজছে নিশ্চয়ই শুধু চা দেবে না চপও দেবে। কিন্তু দিবাকর এক কাপ চা দিয়েই চলে গেল। তা দেখে মুখটা চুপসে গেল নলিনের। ভারি বেয়াড়া মনে হ'ল দিবাকরকে।

একটু পরে পুরুষের মন জয় করার মতই শাড়ি পড়ে নলিনের চোখে চমক সৃষ্টি করে রুবী এসে দাঁড়াল। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পলকহীন চোখে তাকে দেখতে লাগল নলিন। আর তখনই তার মনে হল, রুবীর যৌবন যেন তাকে ডাকছে। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা তার যৌবন যেন কোন রহস্যময় সামুদ্রিক জীব হয়ে রক্তে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

বাড়িটা পিছনে রেখে পথে নেমে ক্ষীণ আলোয় রুবীর দিকে তাকিয়ে নলিন বলল, ফিরোজা রংয়ের শাড়ি কিন্তু বেশ মানায় আপনাকে। আর সত্যি বলতে কি তার থেকেও ভাল লাগছে আপনার ওই রোমান্স ছড়ান রক্তরাংগা পাতলা ঠোঁটটা।

আপনার কথায় বেশ রস আছে দেখছি। তা এতই যদি বোঝেন রোমান্স ছড়ান পাতলা ঠোঁট জোগাড় করলেই তো পারেন। রাত দিন দেখতে পাবেন।

সাধ থাকলেও সাধ্য নেই মিস দত্ত। আমি এখনও বেকার।

তা হলে আগে সাধ্য সাধনা করুন, তারপর সাধ পূরণ করবেন। কথা বলতে বলতে ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে ওরা পাশাপাশি বসল। ওদের যৌবনের স্তরে স্তরে সমুদ্রের শীতল বাতাস ছড়িয়ে পড়ছে। নির্জন বালুতটে বসে ওদের মনে হচ্ছে সমস্ত দিগন্ত যেন আনন্দের প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা একটি অমৃতকুম্ভ।

এক ঝাঁক পাখি মাথার উপরে দিয়ে উড়ে গেল। খুশির হাসি ফুটে উঠল রুবীর মুখে। ঠিক সেই মুহূর্তেই সমুদ্রের মর্মরধ্বনি ভেদ করে ভেসে এল নলিনের কণ্ঠস্বর, নারীর হৃদয়ে পৌঁছনোর পথটা যদি জানতাম।

জেনে লাভ নেই, বড় তুর্গম।

একটা কথা বলব মিস দত্ত ?

বলুন।

আপনার নিঃসঙ্গ জীবন ভালো লাগে ?

আমি তো সঙ্গীহীন নই। মা বাবার চেয়ে ভাল সঙ্গী কেউ থাকতে পারে না।

কিন্তু নারী যে জীবনের স্বাদ খোঁজে, তা তো মা বাবার কাছে পাওয়া যায় না।

আপনি উল্টোভাবে জামা গায়ে দিয়ে নারীর কাছ থেকে কি আশা করেন ? যে পুরুষ নিজের সম্বন্ধে যত উদাসীন, নারীর কাছে সে

ততই দীন হয়ে পড়ে। তাকে নিয়ে সংসারে সং সাজান যায়, ঘর করা যায় না।

নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেল নলিন। তবু মুখে একটা সহজ ভাব এনে হাসবার চেষ্টা করল।

রুবী গম্ভীর। কারণ এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেছে তার স্বপ্নের মানুষ, প্রাণের মানুষ ডাঃ সুজন সেনের কথা। সুজন ওকে কথা দিয়েছে কানাডা থেকে ফিরে এসে বিয়ে করবে। চিঠিও দেয় মাঝে মাঝে কিন্তু দু বছর হয়ে গেল এখনও ফিরে এল না।

ডাঃ সেন বিদেশী মহিলার স্বামী হয়ে সংসার পেতেছে, তবু সে খবর রুবীর কাছে আজও পৌঁছোয় নি। তাই সে আশা করে আছে একটি শুভদিনের জন্য।

দুজনের নীরবতায় শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এল ধীরে ধীরে। তারপর রুবীই বলল, মনে হয় আমাদের দুজনের কাছাকাছি না আসাই ভাল। কথাটা বলে ব্লাউজের ভেতর থেকে চকলেট বার করে মুখে দিল।

আমার তো আপনার কাছে আসার ইচ্ছে ছিল না। অবহেলিত ভংগিতে কথাটা বলল নলিন। তবে এটা শুনে রাখুন, আমি কিন্তু ব্রহ্মচারী নই।

বাঃ, চমৎকার। নির্জন বালুতটে অন্ধকারে নারীর পাশে বসে কথাটা বেশ কাপুরুষের মতই বললেন তো।

কথাটা বলেই নলিনের মনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগল রুবী। সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠির আলোয় ওর মুখটা একবার দেখে কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নলিন। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মুখোমুখি হয়ে বলল, আচ্ছা আপনারা সব বুঝেও এত না বোঝার ভান করেন কেন বলুন তো? কথাটা বলেই আরো কাছে গা ঘেঁসে বসল নলিন এবং আবেগে হাতটা চেপে ধরল রুবীর।

তড়িতাহত হলেও রুবী এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলল, মেয়েদের সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানেন না,

অসভ্য কোথাকার !

চালুনী হয়ে সূঁচের বিচার করছেন ?

ছিঃ, এত নিম্নশ্রেণীর কথা বলতে পারেন আপনি।

নক্ষত্রখচিত নির্জন বালুতটে যখন ওরা এসে বসল তখন কেউ বুঝতে পারে নি এমন একটা বিপর্যয় ঘটবে। নলিনকে যে রুবী অপছন্দ বা অবিশ্বাস করে তা নয়, আবার নলিন যে রুবীকে ভালবাসে না, তাও নয়—তবে কেন এমন হ'ল। কারণ একটাই, নলিন মেয়েদের মন সম্বন্ধে ভীষণ অজ্ঞ। মেয়েদের মনের সুতোয় জোরে টান দিলে সব জট পাকিয়ে যায়। হেঁচকা টানে কাজ হয় না বুঝতে পারল নলিন। মৃদু আলোয় রুবীর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি দুঃখিত।

নরম হ'ল রুবীর মন। আমি জানি আপনি অমানুষ নন। তবু কি যে হয়ে গেল।

ও, কিছু না। আপনাদের মত মেয়েরা নাটকীয়তা পছন্দ করেন কিনা—তাই একটু করলাম আর কি !

মেয়েদের নিয়ে নাটক করার অভিজ্ঞতা আছে তা হলে ?

আছে নয়, ছিল। তাদের উষ্ণ নিঃশ্বাস যে পাই নি তা নয়।

আপনার মুখে কি কিছুই আটাকায় না। চলুন বাড়ি ফেরা যাক।

উঠে দাঁড়াল ওরা। রুবী ভাবল যে কোন মুহূর্তে সর্বনাশের মেঘ ঘনিয়ে আসতে পারে, যাওয়াই ভাল।

এক্ষুণি চলে যাবেন ?

রুবী নিরুত্তর। শুধু তার চোখের তারায় একঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল।

নলিন আর রুবী যখন সমুদ্র সৈকতে ঠিক তখনই ভূত-কুঠির নিস্তব্ধ শান্ত ঘরগুলোয় গ্যাস-বাতির আলো জ্বলে উঠল। স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ালেন মিসেস দত্ত। বললেন, রুবী যে এখনও এল না। যাও, একটু দেখ না।

যাচ্ছি। বলেই ছড়িটা হাতে করে বেরিয়ে গেলেন মিঃ দত্ত। মিসেস দত্ত গেলেন রান্নাঘরের দিকে। পরক্ষণেই লক্ষ্য করলেন মিঃ দত্ত একজন সাহেবকে নিয়ে অফিসে ঢুকলেন।

মিসেস দত্ত দিবাকরকে বলল, তোমাকে বোধ হয় আবার সাহেবী রান্না করতে হবে। দেখ বাবু আবার কাকে ধরে আনলেন।

মনে হচ্ছে এ বাড়ি সম্বন্ধে আপনি সবই জানেন। কথাটা বললেন মিঃ দত্ত।

হ্যাঁ। আর সেই জন্যেই তো দেখতে এলাম বাড়িটা আছে না নেই।

তা দেখে কি মনে হচ্ছে?

সব ঠিক আছে। রংটা যা বদলেছে।

আপনি ভাগ্যবান। ঘর পাবেন।

তা হলে বুক করুন।

কিন্তু আপনার খাওয়া দাওয়া?

ইণ্ডিয়ান ফুডই চলবে। সবুজ স্বপ্নময় যৌবনের স্মৃতি আজও ভুলি নি মিঃ ডট। আপনারা স্বাধীন হলেন, ইংরেজ চলে গেল আমি যেতে পারলাম না। যাক মালপত্তর নিয়ে দশটার মধ্যেই আসব কিন্তু।

আমি অপেক্ষা করব আপনার জন্যে।

ধন্যবাদ।

কথা বলতে বলতে যেভাবে ঢুকেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই বেরিয়ে গেলেন দুজনে। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই পিছন ফিরে সাহেব দেখল, মিঃ দত্ত নেই। একটু আশ্চর্য হ'ল। পর মুহূর্তে ভাবল ভদ্রলোক বোধ হয় হোটেলে ফিরে গেছে।

এতক্ষণ যে ঘটনা ঘটল, আসল মালিক মিঃ দত্ত কিন্তু তার কিছুই জানলেন না। কারণ তখন তিনি সী-বীচে মেয়েকে খুঁজছেন।

মিঃ দত্ত নলিনের নাম ধরে ডাকতেই, রুবী বলল, বাবা বোধহয় খুঁজতে বেরিয়েছেন।

একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যাচ্ছিল ওরা। একটা জেলে ডিঙ্গির পাশ থেকে একটি নারীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে থমকে গেল। আলো আঁধারের মাঝে নৌকোর আড়ালে একটি পুরুষ নারীকে সাপের মত পেঁচিয়ে ধরেছে।

লোকটি বলল, চুপ কর মান্নু।

আমি চুপ করে থাকার মেয়ে নই অশোক।

এখন তুমি নটী নও, আমার স্ত্রী।

স্ত্রী বলেই যে যখন তখন তোমার আবদার রাখতে হবে এমন কোন কথা নয়। কথা শেষ করেই আলুথালু কেশগুচ্ছ ঠিক করে, শাড়ির ভাঁজ থেকে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল মুনমুন। পুরুষটি তখনও কাৎ হয়ে শুয়ে আছে।

এক মুহূর্ত দৃশ্যটা দেখে রুবী চিনতে পারল ওদের। ওরাই তো আমাদের হোটেলে বোর্ডার হয়ে এসেছিল। সেই মুনমুন আর অশোক। তা হলে ওরা এখনও পুরীতে আছে।

মিঃ দত্ত কাছাকাছি আসতেই রুবী বলল, তুমি আবার এলে কেন বাবা?

ওই যে, তোমার মা জননী—

মার সবটাতেই বাড়াবাড়ি।

নলিন বলল, আমি তাহলে যাই। কাল দেখা হবে কেমন? শিস দিতে দিতে অর্জুন বেহারার কাঠগোলার দিকে চলে গেল নলিন।

রুবী আর মিঃ দত্ত এসে দেখলেন চাকর ওপরের ঘর পরিষ্কার করছে। মিঃ দত্ত জিজ্ঞেস করলেন কেউ এল নাকি?

দিবাকর বলল, ওই আপনি যাঁকে আনলেন তিনি তো আসবেন। তাই ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে রাখলাম।

আমি আনলাম? কাকে, কখন?

দিবাকর বলল, মাকে জিজ্ঞেস করুন।

মিসেস দত্ত বললেন, দিবাকর ঠিকই বলছে।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বেশ বিরক্তির স্বরে মিঃ দত্ত বললেন, তোমার

কথার ও কিছু মাথা মুণ্ডু নেই কিছুই বুঝতে পারছি না।

চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে।

আমি তো ছিলাম না। মিঃ দত্ত বললেন।

টাকা নিলে সাহেবের কাছে, কত কথা বললে, খাতায় নাম লিখলে, তা এত সব ভূতে করে গেল? কথাটা বলেই স্বামীর দিকে তাকালেন মিসেস দত্ত।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে মিঃ দত্ত হোটেল রেজিস্টার খুলে দেখলেন। হ্যাঁ, সত্যি একজন সাহেবের নাম লেখা আছে—মিঃ ফুট। তারপর আলমারিতে ভাঁজ করা চারশ' টাকা দেখে আরো বিস্মিত হলেন। এই শীতেও দর্‌দর্‌ করে ঘামতে লাগলেন তিনি; বড় রহস্যময় হয়ে উঠেছে হোটেলটা। উঠে দাঁড়ালেন মিঃ দত্ত। স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন, এ সবের অর্থ কি? তুমি ভেবেছ আমি ভূতের ভয় পেয়ে তোমার সেই গোঁসাই হারামজাদার মাহুলি কবচ পরব? প্ল্যানটা ভালই করেছ।

নাটক যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন মিসেস দত্ত বললেন, দিবাকর তাড়াতাড়ি অগ্নীশ্বর মুখুজ্যেকে ডেকে নিয়ে আয়। হাঁ করে দেখছিস কি—যা।

আমি তো বুঝতে পাচ্ছি না মা, কার কি হ'ল!

তোমার বাবুর স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। এবারে আমাকেও হয়ত স্ত্রী বলে স্বীকার করবে না।

বাবু তো ভালই আছেন।

ভাল থাকলে কেউ বলে সাহেবকে সঙ্গে আনি নি—

সে কি! বাবুই তো সাহেবকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

দিবাকরের কথা শুনে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল মিঃ দত্তের। চোখের তারা দুটো নীল হয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ পর বিচিত্র ভংগিতে দিবাকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, সত্যি কি সাহেবের সাথে আমাকে দেখেছ?

দিবাকর বেশ জোর দিয়েই বলল, হ্যাঁ দেখেছি।

কথাটা শুনে মিঃ দত্ত বিষাদ মাখান কাঁপা কাঁপা গলায় দিবাকরকে বললেন, ঠিক আছে, যাও। তারপর স্ত্রীকে বললেন, আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়েছ নিশ্চই ?

তোমার ওই ভূতুড়ে রসিকতা দেখলে কার না রাগ হয় বল ? বলেই স্বামীর কাছে আবদারের সুরে বলল, তোমার কথা অবিশ্বাস করি না। আমার মনে হচ্ছে তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে এবং যে চুরুট খেয়েছিল এ তারই কাজ।

সে লোকটি কে ? আমার মতই বা হয় কি করে ! আমি কি জীবিত—না মৃত, বুঝতে পাচ্ছি না।

আমার মনে হয় অদৃশ্য আত্মা তোমার রূপ ধরে এই সমস্ত অকল্পনীয় কাজ করে যাচ্ছে, হয়ত তার কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে।

স্ত্রীর কথাটা শুনে মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল মিঃ দত্তের—প্রকৃত পক্ষে তার বোধ শক্তিই যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

খস্‌খস্ পায়ের শব্দ। সে আসছে। ছায়া ছায়া অন্ধকারেই মিঃ দত্তের সামনে এসে দাঁড়াল সে। গ্যাস-বাতির আলোয় পরস্পর পরস্পরকে দেখল। পাইপে টান দিতে দিতেই ফুট সাহেব বলল, আসতে একটু দেরি হয়ে গেল মিঃ ডট।

খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সাহেবের হাবভাব দেখলেন মিঃ দত্ত। বললেন, আপনার তো এই সময়ই আসার কথা ছিল। বলেই বেয়ারাকে ওপরে

এগার নম্বর ঘরে মালপত্তর দিয়ে আসতে বললেন মিঃ দত্ত।

ফুট সাহেবকে দেখে বেশ অর্থশালী ও অহংকারী বলেই মনে হচ্ছে। এই প্রৌঢ় বয়সেও তারুণ্যের ছাপ। ইনি যার সাথে কথা বলে হোটেল ঢুকেছেন তিনি কিন্তু মিঃ দত্ত নন, অন্য কোন প্রেত। ঘটনাটা যে সত্যি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সৌভাগ্যের বিষয় ঘর নেওয়ার সময় ভৌতিক মানুষের সাথে যা কথা হয়েছিল তার আভাস ফুট সাহেব না দিলে মিঃ দত্ত খুবই অসুবিধায় পড়তেন।

নির্দিষ্ট রুম পেয়ে খুশি হ'ল ফুট সাহেব। মালপত্তর গোছাতে গোছাতে জানলা দিয়ে পাশের বাড়িগুলোকে দেখে ঘুমন্ত বলেই মনে হ'ল তার। একটু পরে একটা সরস গানের কলি গুণগুণ করতে করতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে জ্যাকসন সাহেবের সেই খাটটায় বসল। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে বার কয়েক হাত বুলিয়ে ব্যাগ থেকে একটা স্কচের বোতল খুলে আকণ্ঠ পান করল। ঘণ্টাখানেক পর বেয়ারা রুচিকর খাদ্য এবং কফির পাত্র রেখে গেল। পরম তৃপ্তির সাথে আহার শেষ করে পাইপে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে করিডোরে পায়চারি করতে লাগল মিঃ ফুট।

রাত এগারটা। এরই মধ্যে হোটেলটাকে ভীষণ নির্জন মনে হচ্ছে সাহেবের। নিচের লোকগুলি আহার শেষে শুয়ে পড়েছে। ওপরে কোন লোক নেই, স্বভাবতই পরিবেশটা ভাল লাগছে না তার। তবু সারা দিনের ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসছে বলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল সাহেব। এখন ওকে দেখলে মন হবে ভূগর্ভ সমাধির শীতল শয্যায় যেন শুয়ে আছে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল মিঃ ফুটের। অনিচ্ছা সত্বেও বাথরুমে গেল এবং পরক্ষণেই আবার শয্যা গ্রহণ করল কিন্তু ঘুম এল না। কোথা থেকে যেন সুমধুর সুর ভেসে এসে ওর মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কান খাড়া করে সুরের ছন্দটা বোঝার চেষ্টা করল আর তখনই মনে হ'ল, এ বিষাদময় করুণ সুর তার খুবই চেনা। সুরটা যত স্পষ্ট হতে লাগল ফুট তত অস্থির হয়ে উঠল। আর শুয়ে থাকতে পারল না। ঘর থেকে বেরিয়ে

পাশের করিডোর পার হয়ে সুরটা লক্ষ্য করে সেই হল ঘরটায় ঢুকল। রহস্যটা বোঝার জন্য এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ঢুকে দেখল কেউ কোথাও আছে কি না। না কেউ নেই। খুব চিন্তিত মনেই আবার নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই পিয়ানো সুর ওকে মন্ত্রমুগ্ধের মত আকৃষ্ট করতে লাগল।

ঘুম আসছে না। ঘড়িতে দুটো বাজতে দশ মিনিট বাকি। দেয়ালের দিকে তাকাতেই খাটের ছায়াকে ভ্যামপায়ারের মত মনে হচ্ছে। আর তখনই একটা ভৌতিক চিন্তা মাথায় পাক খেয়ে উঠল। হঠাৎ পিয়ানোর সুরটা বন্ধ হতেই ব্যাপারটা আর একবার বোঝার চেষ্টা করল। তখনই কার যেন তপ্ত নিঃশ্বাস ঘাড়ে লাগল। স্পষ্ট বুঝল নিস্তব্ধ বাড়িটার গাঢ় অন্ধকারে কেউ যেন তার ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বার বার তিনবার উষ্ণ নিঃশ্বাস ঘাড়ে পড়তেই ভয় পেয়ে গেল মিঃ ফুট। কিন্তু ব্যাপারটা যখন চরমে উঠেছে তখন মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে ফুট খাট থেকে এক লাফে নেমে পড়তেই অদ্ভুত রকমের একটা কালো বেড়াল হিংস্র কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

ফুট হ্যাট হ্যাট শব্দ করে তাড়াবার আগেই ঘাড়ে আঁচড় দিয়ে বিশ্রি আওয়াজ করে টেবিলের নিচে বসে পড়ল বেড়ালটা। এ ধরনের বেড়াল দেখে খুবই আশ্চর্য হ'ল মিঃ ফুট—পরক্ষণেই ভাবল এটা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা ঠিক নয়। বিশেষ করে নিজের নিরাপত্তার কথাটাই বেশি মনে হচ্ছে তার। কাজেই একে তাড়াতে হবে। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে বালিশটাই ছুঁড়ে মারল। সেই মুহূর্তেই সমস্ত স্তব্ধতা ভেদ করে আর্তচিৎকারে বেড়ালটা আবার আক্রমণ করল ফুটকে। তীক্ষ্ন নখ দিয়ে আঁচড়ে বিদ্যুৎবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরক্ষণেই ফুটের মনে হ'ল জানলা দরজা বন্ধ, তা হলে বেড়ালটা গেল কোনদিক দিয়ে? তবে ওটা যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে এটা অবিশ্বাস্য। ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখল বেশ খানিকটা জায়গায় ক্ষতের

সৃষ্টি হয়েছে। বাথরুমে গিয়ে রক্তটা পরিস্কার করে হাতে মুখে জল দিয়ে সোফায় বসে আর একপ্রস্থ ধূমপানে মন দিল। এবং রহস্যজনক ঘটনার বিষয়ে চিন্তা করতে করতে ভয়ানক একটা আতংক আর ভয়ে স্নায়ুর উত্তেজনা বেড়ে গেল তার। আর তখনই মনে হ'ল ঈষৎ অস্পষ্ট আলো আঁধারে একটা ছায়ামূর্তি, ওর হৃদপিণ্ডটাকে স্পর্শ করে অতৃপ্ত আকাঙ্খার কথা বলে সেকেণ্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও অলৌকিক অনুভূতি বা অতৃপ্ত আত্মার কথা অবিশ্বাস করতে পারল না ফুট। এ ভাবেই নিস্তব্ধ রাত্রির মাঝে ঘুমন্ত বাড়িরটার এগার নম্বর রুমে বিষণ্ণ মনে চেয়ারে বসেই রাতটা কাটাল সে।

ভোর হয়ে এসেছে। জানলায় তাকিয়ে দেখল ঝাউবীথি ভেদ করে সূর্যের নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে বাড়ির অঙ্গনে। দরজায় খট্ খট্ আওয়াজ। কেউ বোধ হয় ডাকছে। খালি পায়ে খস্‌খস্ শব্দে এগিয়ে দরজা খুলে দেখল বেয়ারা বেডটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেয়ারা ঢুকে পট রেখে চলে যাচ্ছিল হঠাৎ সাহেবের ঘাড়ে নজর পড়তেই দেখল বেশ খানিকটা জায়গা ফুলে উঠেছে, মুখের চেহারাটাই যেন বদলে গেছে। বেয়ারা সহানুভূতির সাথে বলল, আপনি কি অসুস্থ ?

না ভালই আছি।

বেয়ারা বেরিয়ে গেল কিন্তু অজানা আশঙ্কায় তার মনটাকে মুহূর্তে অসাড় করে দিল। ভাবল সাহেব কি রাত্রে আত্মহত্যা করতে গেছল ?

সকাল আটটা। প্রাতঃরাশ শেষ করে বেশ একটা উত্তেজনা নিয়েই নিচে নামল মিঃ ফুট। বারান্দায় মিঃ দত্তের মুখোমুখি হতেই সাহেব বলল, গুড মর্ণিং মিঃ ডট।

গুড মর্ণিং। রাতে কোন অসুবিধা হয় নি তো ?

না, সে রকম কিছু হয় নি। তবে আপনার হোটেলের বেড়ালগুলো

অত্যন্ত ডেঞ্জারাস। ভীষণ উৎপাত করেছে।

হোটেলে তো বেড়াল নেই। তবে এটা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন ওটা নিশ্চয়ই পাশাপাশি বাড়ি থেকে এসে থাকবে।

চমৎকার বলেছেন। সত্যি আপনার কথার প্রতিবাদ করতে পারলাম না।

ঘরটা কি চেঞ্জ করে দোব?

না, কোন প্রয়োজন নেই। তবে একটা অনুরোধ গভীর রাতে যেন পিয়ানো বাজন না হয়।

কথাটা শুনেই মিঃ দত্ত বোবা দৃষ্টিতে মিঃ ফুটের দিকে তাকালেন। তারপর অত্যন্ত নির্বোধের মত হতবিহ্বল ভাবে খানিকটা জড়তা মেশান হাসি টেনে বললেন, আমি দুঃখিত।

কথাটা শেষ হতেই সাহেব অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা নুইয়ে বেরিয়ে গেল এবং সেই মুহূর্তে অন্তত নিরুদ্বিগ্ন শান্ত বলেই মনে হ'ল তাঁকে।

সাহেব চলে যেতেই মিঃ দত্ত ব্যাপারটা ভাবতে লাগলেন আর ভাবতে গিয়েই এমন সমস্যায় জড়িয়ে পড়লেন যে, কোন যুক্তি সম্মত ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন না। তাই তিনি সংযত অবিচলিত ভাবেই স্ত্রীর সাথে রাতের অবিশ্বাস্য ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। বিশেষ

করে পিয়ানোটাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল।

মিসেস দত্ত বললেন, কি করতে চাও তুমি?

পিয়ানোটা বিনায়কের বাড়িতে পাঠিয়ে দোব।

আশ্চর্য মানুষ। পিয়ানোটাকে তোমার এত ভয়!

তুমি আর কি বুঝবে? অশান্তিতে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। এই দেহটাকেই এক এক সময় মনে হয় অন্যের দেহ।

এই আবার আবোল তাবোল বকতে স্থুরু করলে।

না, আবল তাবোল নয়। ঘুমের মধ্যে বেশ বুঝতে পারি কে যেন আমার হৃৎপিণ্ডটা উল্টে পাল্টে ফুসফুসে সুড়সুড়ি দেয়। এক এক সময় দেহটা শক্ত হয়ে যায়। নিঃশ্বাস নিতে গেলে জিভটা বেরিয়ে আসে। তা দেখে একটা কংকাল খিলখিলিয়ে হাসে. উঃ কি ভয়ঙ্কর সে দৃশ্য! এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন মিঃ দত্ত।

কথাটা শুনে মিসেস দত্তের মুখটাও ছাইয়ের মত হয়ে গেল। কয়েক মিনিট নীরব। তারপর আবার নিস্তেজ ভাবটা কাটিয়ে কাজে মন দিলেন দুজনে।

বিনায়ককে আসতে দেখে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে গলায় ঝোলান মরু শৃগালের নখের লকেটটা চাদর ঢাকা দিলেন কবরেজ। অন্যমনস্ক-ভাবে আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল বিনায়ক। তা দেখে কুঁচো ছেলের দল হি হি করে হাততালি দিয়ে উঠল। বিজয়ীর উল্লাসে দৃশ্যটা উপভোগ করল ছেলেরা—কারণ পাথরটা পথের মাঝে ওরাই রেখেছিল। আস্তে আস্তে পা টেনে টেনে বিনায়ক কবরেজের কাছে বসতেই কবরেজ বললেন, খুব লেগেছে বুঝি? কই, দেখি পাটা। হ্যাঁ মচকে গেছে। কথা বলেই কবরেজ উঠে গিয়ে মরু শৃগালের নখটা ঘষে তার সত্তাটা লাগিয়ে দিতেই ম্যাজিকের মত যন্ত্রণা কমে গেল এবং পাটা স্বাভাবিক হয়ে গেল। মুহূর্তে বিনায়কের মনে হ'ল ও জিনিসের যখন এতগুণ তখন না দিলেই ভাল হ'ত। সবচেয়ে

আশ্চর্য কবরেজের হাঁপানী সেরে গেছে, দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন তিনি।

একটু পরেই শব্দহীন পৃথিবীর বুকে যেন বাজ পড়ল। 'ওটা আমাকে দিতে হবে'—কথাটা বলেই বিনায়ক তাকাল কবরেজের দিকে।

কবরেজের চোখে শূন্য চাউনি। সমুদ্রের ঢেউ যেন আঘাত করল তাঁকে। যা যায় তা আর আসে না। ওটা দোব না।

কবরেজের সতেজ উক্তিতে বিনায়কের দাম্ভিকতার অস্তিত্বটা সহসা যেন নিস্তেজ হয়ে গেল। তাকে কেউ যা বলতে সাহস করে নি তাই বললেন তিনি। কবরেজ নিজের জীবন নিংড়ে সমস্ত বিষটা যেন ঢেলে দিল বিনায়কের দেহে। কিন্তু এর মূল রহস্য কোথায়? ওই মরু শৃগালের নখের মধ্যেই সব রহস্য লুকিয়ে আছে। ওটা যার কাছে থাকে তার ইচ্ছাশক্তি বেড়ে যায়। ফলে যে কোন প্রাণীর শক্তি কেড়ে নিতে পারে সে। গোখরো সাপকেও ইচ্ছামত সে খেলাতে পারে, আর বিনায়ক তো কোন্ ছার।

বিনায়ক তাকাল কবিরাজের দিকে। দেখল নাকের ওপর ছুটো জ্বলন্ত চোখ অবিশ্বাস্য ভাবে ওকে অনুসরণ করছে। সাদা চুলের বৃদ্ধ মানুষটা যেন একটা দানব। অসহ্য একটা ভীতি নিয়ে নীরবে চলে গেল বিনায়ক। এটাও কি কোন ভৌতিক কাণ্ড না দ্রব্যগুণ?

মিঃ ফুট বালুতটে দাঁড়িয়ে রাতের ঘটনাগুলো ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই সন্দিহান হয়ে উঠেছে। যা ঘটেছিল তা কি সত্যি? না মনের ভুল? বেড়ালের আঁচড়টা তো বাস্তব—তাহলে সন্দেহটা যায় কোথায়?

এই ভাবে চিন্তার জাল বুনতে বুনতে মিঃ ফুট নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের মত কিছুক্ষণ সৈকতে কাটিয়ে ফিরে এল হোটেলে।

মিঃ দত্ত বাগানে চেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন। সাহেবকে দেখেই কাছে ডাকলেন।

ফুট গিয়ে বসতেই কফি এল, তারপর আরম্ভ হ'ল গল্প। ফুট সাহেবই বলতে লাগল তার সমুদ্রযাত্রার বিচিত্র সব কাহিনী। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্মান্তিক ঘটনা কিন্তু এই বাড়িতেই ঘটেছিল মিঃ ডট এবং শুনলে আশ্চর্য হবেন আমিই তার নায়ক।

বলেন কি মশাই ?

হ্যাঁ। সেদিন যা ঘটেছিল তাতে অন্তহীন অন্ধকারে অসীম গহ্বরের হিমশীতল ছায়ায় হয়ত ঘুমিয়ে থাকতাম। কিভাবে যে সেদিন গুলির মুখ থেকে বেঁচে গেছলাম ভাবতে অবাক লাগে।

কিন্তু ঘটেছিল কি ? কোন ডাকাতের কবলে পড়ে ছিলেন বুঝি ?

না। যা ঘটেছিল তা হচ্ছে···বলেই সেই জ্যাকসন সাহেব এবং মিসেস জ্যাকসনের সাথে নিজের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটেছিল সমস্ত বললেন মিঃ ফুট।

ঘটনা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন মিঃ দত্ত। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, খুবই মর্মান্তিক বেদনাদায়ক কাহিনী।

না-না কাহিনী নয় মিঃ ডট। এ সব অত্যন্ত সত্য।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ঘরে ঘরে হোটেলের বেয়ারাটি গ্যাস-বাতিগুলো জ্বেলে দিল। বাগানে বসেই তা লক্ষ্য করল ফুট। কে যেন খোঁজ করছে মিঃ দত্তের, তাই তাকে উঠে যেতে হ'ল। সাহেবও ওপরে গিয়ে ঘন্টাখানেক ধরে নিজের উপর পরিচর্যা করে, আরাম কেদারায় দেহ এলিয়ে মেজাজে পাইপে টান দিতে লাগল। তারপর ডিনার শেষে এক কাপ কফি পান করে শুয়ে পড়ল মিঃ ফুট।

রাত্রি হলেই হোটেলের প্রতিটি কক্ষে এক অবর্ণনীয় স্তব্ধতা নেবে আসে এবং সে স্তব্ধতা যে মানুষের মনে একটা অস্বাভাবিক ভৌতিক অনুভূতির শিহরণ জাগাতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে ঐ ধরণের বিচিত্র ঘটনা যখন মানুষের স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে অথচ যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন ধরেই নেওয়া যায় ওগুলো

ভৌতিক ঘটনা এবং খুবই সত্য।

ধূপ করে একটা শব্দ হতেই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল সাহেবের। তাকাল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

উঠে মোমটা জ্বালাল কারণ গতরাতের ঘটনা মনে পড়ে গেছে। মোম হাতে নিয়ে ঘরের চারদিক ভাল করে দেখতে গিয়েই নজর পড়ল কাচের গ্লাসের উপর। মেঝেতে বোতল আর গ্লাস গড়াচ্ছে। টেবিলের উপর তুলে রেখে আবার শুয়ে পড়ল কিন্তু মিনিট দশেকের মধ্যেই আবার শব্দ। উঠে দেখল গ্লাস বোতল মেঝেতে নামান। এ ব্যাপারটায় খুবই বিস্মিত হল ফুট। তবু জিনিস দুটি আবার উঠিয়ে রাখল। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে ওর চোখের সামনেই ঘটল শ্বাসরোধকারী অদ্ভুত একটা ঘটনা। কালো দস্তানা পরা একটা হাত নিপুনভাবে বোতল আর গ্লাসটা টেবিল থেকে সরিয়ে নিল।

ফুট উঠে বসল। আর তখনই সেই হাতটা শূন্যে ভাসতে ভাসতে ওর মুখের কাছে স্থির হয়ে আঙ্গুলগুলো নাড়াতে লাগল। আকস্মিক একটা ভাসমান হাতের ক্রিয়াকলাপ দেখে সাহেবের রক্তের চাপ বেড়ে যেতে লাগল। ও তাড়াতাড়ি ঘর থেকে পালাতে চাইল কিন্তু ওর কোলে এসে পড়ল একটা মোহর। মোহরটা দেখে বহুক্ষণ একটা কথাও বলতে পারল না সে। মোমটা পুড়ে ঘরটা অন্ধকারে ঢেকে ফেলতেই খেয়াল হ'ল আর একটা মোম জ্বালান দরকার। মোম জ্বালিয়ে আবার দেখল মোহরটা। হ্যাঁ, এতো সেই মোহর। যে মোহর জাহাজ থেকে চুরি হয়েছিল। ভাসমান হাতটা কিন্তু মোহর পড়ার সাথে সাথেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তাহলে কি মোহরগুলো এ-ঘরে কোথাও আছে? খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরটির প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজল কিন্তু মোহরের সন্ধান পেল না। অগত্যা মোমটা টেবিলে রেখে চেয়ারে বসতেই কানে ভেসে এল রবসনের কণ্ঠস্বর 'আঙ্কেল আমি রবসন কথা বলছি : আপনি ভয় পাবেন না।'

বুক কেঁপে উঠল ফুটের। তবু তীব্র বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি কোথায়? কিন্তু কি আশ্চর্য রবসনের কোন অস্তিত্বই দেখতে পেল

না। ভাবল, তাহলে কি ভুল শুনলাম। কথাটা ভাবতে ভাবতে চিন্তার আবর্তে তলিয়ে গেল মিঃ ফুট।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে মিঃ ফুটের। দরজায় খটখট আওয়াজ হল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে তাকাল ফুট, মুহূর্তে বেড়ালের তীব্র আর্তস্বরে ঘরটা গম্‌গম্ করে উঠল। গত রাতের সেই বেড়ালটা আজ আবার ধূসর রংয়ের একটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এল কি করে? সাদা সাদা দাঁত বের করে কুটিল চোখে এগিয়ে আসছে বেড়াল দুটো। আত্মরক্ষার জন্যে গ্লাসটা হাতে নিল ফুট। ভয় দেখাবার জন্য মুখে হ্যাট হ্যাট শব্দ করল, কিন্তু বেড়াল দুটো লোম খাড়া করে গর্জাতে লাগল। আর তখনই হাল্কা বাতাসে একটা দুর্গন্ধ ভেসে এসে ঘরের আবহাওয়াটা অবর্ণনীয় করে তুলল। এ পরিস্থিতিতে ফুটের শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যেতেই রাগে গ্লাসটা ছুঁড়ে মারল ওদের ওপর। সারা ঘর কাচের টুকরোয় ভরে গেল। আর সেই আঘাতে বেড়াল দুটো সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে সারা ঘরময় ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর বিদ্যুৎবেগে বেড়াল দুটো ঘর থেকে বেরিয়ে সেই মৃত গাছটার কাছে গিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ল ফুট দেখতে পেল না। অনন্ত বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে ফুট ভাবছে এখন কি করা যায়, আর তখনই ধূসর বেড়ালটা সুড়ঙ্গ থেকে মেঁউ-মেঁউ করে ডেকে উঠল।

সাহেব বিন্দুমাত্র শব্দ না করে একটা অস্থির উত্তেজনা নিয়ে নিচে নেমে সুড়ঙ্গের পাথরটা সরাতেই ছায়া ছায়া অন্ধকারেই দেখল কি যেন জ্বলজ্বল করছে। ফস করে দেশলাই জ্বালল। আর তৎক্ষণাৎ মোহরের স্তূপ দেখে আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর। কিন্তু মোহরে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেই রবসনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলঃ 'আঙ্কেল আমি যে মোহর চুরি করেছিলাম, একটি ছাড়া সব আছে। আপনি নিয়ে যান।'

কথাটা শুনে মারমুখি হয়ে উঠল ফুট। বলল, বিশ্বাসঘাতক, তুমি কোথায়?

আমি জীবিত নই আংকেল।

কথাটা কানে যেতেই ক্রোধটা ম্রিয়মান হয়ে একটা শোকাবহ আবহাওয়ার বাতাস যেন সঞ্চারিত হ'ল তার মনের গভীরে। বেশ কয়েক মিনিট স্তব্ধ নির্বাক থেকে ফুট বলল, আমি তোমাকে দেখতে চাই।

আমি দেহধারণ করতে পারব না। তবে আমি যে আপনার কাছেই আছি তা বোঝাবার জন্য স্পর্শ করছি।

মুহূর্তে সমস্ত শরীর যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল ফুটের। ও বেশ বুঝতে পাচ্ছে একটা হিমেল হাওয়ায় দেহের নাড়ীভুড়িগুলো পর্যন্ত অবশ করে দিচ্ছে। এতক্ষণে সত্যি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল ফুট। আতংকগ্রস্থ উন্মাদের মত আর্তস্বরে চিৎকার করে উন্মত্ত ভাবে ওপরে ছুটে গেল। এ ভয়াবহ ঘটনায় মিঃ ফুটের মুখটা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। পা দুটো ঠক্‌ঠক্ করে তখনও কাঁপছে।

মৃত রবসনের প্রেতাত্মা আবার বলে উঠল: 'আমি চলে যাচ্ছি, আপনিও মোহর নিয়ে চলে যান।'

এতক্ষণে স্বাভাবিক হল মিঃ ফুট। নিঃশব্দে চেয়ারটায় বসে ভাবতে লাগল রবসনের কথা উপেক্ষা করা বোধ হয় ঠিক হবে না।

পর মুহূর্তে ভাবল বাস্তববাদী মানুষ হয়ে ভূতকে ভয় পাব কেন? যখন সুবিধা হবে তখনই মোহর নিয়ে পালাব। কিন্তু পরক্ষণেই আবার একটা অজ্ঞাত ভয়ের আশংকা দেখা দিল মনের কোণে। মুহূর্তে সব বিচার বুদ্ধি অন্ধকারে তলিয়ে গেল। শুতে গেল ফুট। কিন্তু এ কি! মনে হচ্ছে কে যেন কাঁদছে। হ্যাঁ, সত্যি কান্না ভেসে আসছে সেই পরিত্যক্ত কুঁয়োটার ভেতর থেকে। নিস্তব্ধ অন্ধকারের মাঝে, ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের নীরব কান্নার মত সেই কান্না সমুদ্রের বুকে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের গুম্‌গুম্ আওয়াজের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল সে কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। রাতটা অনিদ্রায় কাটল তার।

—গুড মর্ণিং স্যার। রাতে কোন অসুবিধা হয় নি তো? বেয়ারা

টেবিলের ওপর চায়ের পট রেখে কথাটা বললে।

না-না। তবে বেশি দিন বোধ হয় থাকা হবে না।

বেয়ারা সাহেবের কথাটা শুনে উদগ্রীব হয়ে মুখের দিকে তাকাল। আর তখনই তার মনে হ'ল কেউ যেন সারা রাত ধরে সাহেবের রক্ত চুষে খেয়ে ফেলেছে।

আপনি কি অসুস্থ?

কেন বল ত?

আপনাকে কেমন যেন অন্য মানুষ দেখাচ্ছে।

না-না, আমি ঠিক আছি।

বেয়ারা চলে যেতেই সাহেব চা পান করে সী-বীচে চলে গেল। সূর্য তখন সবেমাত্র সমুদ্রের বুকে উঁকি দিচ্ছে কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রকৃতি বিমুখ হ'ল।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশে কালো ছায়া ঘনীভূত হয়ে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। হোটেলে ফিরে এল ফুট। ওপরে না গিয়ে অফিসেই বসল। গুড মর্ণিং মিঃ ডট।

গুড মর্ণিং। আরে আসুন, আসুন।

সকাল থেকেই বৃষ্টি। এ এক বিশ্রি ব্যাপার মশাই।

আর বলেন কেন।

দেখতে দেখতে অন্ধকারে ঢেকে গেল বাড়িটা। অভিশপ্ত ভূতুড়ে বাড়িটার বুকে নেমে এল শ্মশানের কান্না। ঝড়ো হাওয়ায় জানলা দরজার পাল্লাগুলো ক্যাচ ক্যাচ শব্দে আর্তনাদ করে সাত সকালেই পরিবেশটাকে ভয়ংকর করে তুলল।

ওদের কথার মাঝেই বিনায়ক এসে ঘরে ঢুকল। হঠাৎ এভাবে ছাতা মাথায় বিনায়ককে আসতে দেখে, মিঃ দত্ত বুঝলেন কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে। মিঃ দত্ত বিনায়কের সাথে সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, বসুন চা বলে আসি।

সাহেব বলল, বাড়িটা কিনে ভালই করেছেন মিঃ মিত্র। এত সুন্দর বাড়ি খুব সস্তায়ই তো পেয়েছেন।

কিন্তু ভূতের বাড়ি না হলে কি এত সস্তায় হ'ত।

আপনি কি প্রেতাত্মার কথা বলছেন ?

হ্যাঁ।

ও সব বিশ্বাস করি না—তবে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা দেখলে মনে যে চাপ পড়বে না, তা নয়। তা বলে তাকে ত আর ভূত বলা চলে না।

মিঃ দত্ত ফিরে এসে বললেন, তা হলে আপনি বলতে চান ভূত-প্রেত এসব মিথ্যে।

বিনায়ক বলল, আমি কিন্তু ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি।

ফুট বলল, আসলে মাঝে মাঝে মানুষের সামনে কিছু কিছু গূঢ় রহস্যজনক ঘটনা ঘটে থাকে এবং সেই রহস্যের যখন কোন সমাধান খুঁজে না পান তখন মানুষ নার্ভাস হয়ে পড়েন। তাকেই বলে ভূতের কাণ্ড।

কথাটা বলেই আস্তে আস্তে কেমন যেন হয়ে গেল মিঃ ফুট। আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে চা না খেয়েই ওপরে চলে গেল এবং পকেট থেকে সেই মোহরটা বার করে এক দৃষ্টে দেখতে লাগল। ফুটের ব্যবহারটা শুধু অমার্জিত নয় অদ্ভুত লাগল বিনায়কের। 'শালা' জাতিয় একটা কথা উচ্চারণ করে ঘর থেকে উঠে গেল। মিঃ দত্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে স্ত্রীকে বললেন, বিনায়কবাবু রহস্যজনক ভাবে ওপরে কেন গেল বল ত ?

বোধ হয় ঘরগুলো কি ভাবে ব্যবহার করছি তাই দেখতে গেল।

একটু পরেই রুবী এসে বলল, জানো বাবা বিনায়কবাবু সাহেবকে তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

কেন ?

শ্যামলের সাথে ওর যে সব কথা হচ্ছিল শুনেছি।

কিন্তু কারণটা কি ?

সে কথা পরে বলব। আর এও জেনো এ বাড়ি ছাড়ব না।

মেয়ের কথা শুনে মিসেস দত্তের মনে কিন্তু কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল

না। শুধু লক্ষ্য করলে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্লাউজের বোতাম লাগাতে লাগাতে আপন মনেই রুবী বলছে, এ বাড়িতে মোহর আছে।

বাড়িটা আমার পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। রাগের সাথেই মিঃ দত্ত কথাটা বললেন।

বৃষ্টি আরো জোরে নামল। অবিশ্রান্তভাবে জলের ঝাপটা এসে আছড়ে পড়ছে দরজার ওপর। তারই ফাঁকে মিসেস দত্ত কফি কাপে ঢালছেন।

রুবী প্রসাধনের প্রলেপে গালের উপর ব্রণের গর্ত ভরাট করেছে আর মিঃ দত্ত চুরুটে অগ্নিসংযোগ করেছেন।

ওপরের ঘরে মোহরটা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে শরীর ম-: রোমাঞ্চিত হয়ে রাতের ঘটনাগুলো স্মৃতিপটে জেগে উঠেছে ফুটের ভয়ংকর একটা আতংক যেন গ্রাস করতে আসছে তাকে। আস্তে আস্তে মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল তার। আর তখনই একটা মৃত্যু ভয় দেখা দিল মনে। কাজেই অকস্মাৎ সিদ্ধান্ত নিল যে ভাবেই হোক আজ রাতেই মোহর নিয়ে সে পালাবে। কাজটাও এই দুর্যোগপূর্ণ রাতেই সুবিধা হবে।

আচমকা বিনায়ক ঢুকল ফুটের ঘরে। তাকে দেখে ফুট শিউরে উঠল। বলল, কে? ওঃ, আপনি। কথাটা বলতে গিয়েই হাত থেকে মোহরটা পড়ে গেল। ফুট দ্রুত মোহরটা কুড়োবার আগেই বিনায়ক উঠিয়ে নিল। তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে তাকাল ফুট। নির্বুদ্ধিতার জন্য রাগই হ'ল নিজের উপর। তবু বলল, ওটা আমার।

বিনায়ক চুপ করেই ছিল কিন্তু যখন দেখল সাহেবের চোখ দুটো খুব দ্রুত হিংস্র হয়ে উঠছে, তখন নিজেও সতর্কতার সাথে মুখোমুখি হ'ল, এবং বেশ তেজী অথচ ধারাল ভাষায় বলল, আমি সব জানি। গুপ্তধনে যে হাত দেবে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দোব।

কথাটা শুনে রাগে ঠোঁটটা নড়ে উঠল ফুটের। বিদ্বেষ ভরা স্বরে অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি বসিয়ে দিল বিনায়কের

মুখে। হাত তিনেক দূরে কাৎ হয়ে পড়ে গেল বিনায়ক। কিন্তু বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে এক লাথি মারল সাহেবের পেটে।

কর্কশ আর্তস্বরে খাটে শুয়ে পড়ে মিনিট তিনেক পৃথিবী অন্ধকার দেখল সাহেব। বিনায়ক শিষ দিচ্ছে। সাহেবের উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই।

আধঘন্টাপর আস্তে আস্তে উঠে বসল সাহেব। ভাবল অন্যায়টা তারই, সেই আগে হাত উঠিয়েছে।

আমি দুঃখিত মিঃ মিত্র। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আপনার ওপর আমার কোন রাগ নেই, কিন্তু আপনি কি ঐ মোহরের ইতিহাস জানেন? যদি জানেন তা হলে ঐ জিনিস দাবী করব না।

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ। বিনায়ক ভাবল আমি তো জানি না শুধু বলতে পারি তোমার মত আমার কাছেও একটা মোহর আছে। চিন্তার স্রোতে হাবু ডুবু খেতে খেতে বেরিয়ে যেতে চাইল বিনায়ক। সাহেব দরজায় পিঠ রেখে পথ রোধ করে দাঁড়াল। আমি জানি। তাই আপনার মত লোভী মানুষকে ইতিহাস শোনাব মনে করছি। সব শুনে যদি মিথ্যা বলে মনে করেন আমি চলে যাব।

সাহেবের ঝাঁঝাল কথাটা বিনায়কের পিঠে যেন হুল ফোটাল। তবু বলল, বলুন কি বলার আছে?

তবে শুনুন আমার কাছে যেমন একটা মোহর আছে আপনার কাছেও একটা আছে। ওটা নিয়েই শান্ত থাকুন। না হলে অন্ধকারে তলিয়ে যাবেন। কথাটা বলেই বোতলের দিকে মুখ ফেরাল সাহেব। আলমারিতে রাখা স্কচের বোতল পুরোটাই আছে।

বিনায়ক উত্তেজিত হয়েই বলল, আপনার কাছে অপমানজনক কথা শুনে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি কি তাড়াতাড়ি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে চান? আমি জানতে চাই ঐ মোহরের রহস্যটা কোথায়?

সেটা জানা বোধ হয় ভাল হবে না। তবু বলছি, শুনুন। বলেই ঘটনাটা বলল। মুখ দিয়ে হিস্ হিস্ শব্দ আর বলার ভঙ্গিতে বিনায়কের অন্তরে একটা আতংক সৃষ্টি করে তুলল ফুট সাহেব। কিন্তু

সব শোনার পর বিনায়ক ভাবল এটা নিছক কাল্পনিক কাহিনী। আমাকে মোহর থেকে বঞ্চিত করাই বোধ হয় আসল উদ্দেশ্য।

সব তো শুনলাম। কিন্তু মোহর কোথায় আছে তা তো বললেন না মিঃ ফুট ?

ফুট সাহেব হাসল। তারপর বলল, শুধু বলা নয়, দেখিয়েও দোব তবে আজকের এই দুর্যোগের দিনটা অপেক্ষা করতে হবে।

কথাটা শুনে বেশ ব্যঙ্গের সুরেই বিনায়ক বলল, আপনার কথা কাল্পনিক, অবিশ্বাস্য বলেই মনে হচ্ছে।

কেন ?

—কারণ মোহর যখন এ বাড়িতেই আছে, তখন দুর্যোগ বাধা হতে পারে না।

আমি বুঝতে পাচ্ছি মোহরগুলো পাওয়ার জন্য আপনি খুবই উদগ্রীব। ঠিক আছে এখুনি আপনাকে নিয়ে যাব কিন্তু তার আগে আমার একটা অনুরোধ রাখবেন নিশ্চয়। আসুন আমরা এক সাথে একটু মদ্যপান করি। আলমারি থেকে বোতল বার করল ফুট।

ও সিওর! সত্যি কথা বলতে কি স্কচের বোতল দেখে বিনায়ক এতো খুশি হ'ল যে সব তিক্ততা ভুলে গিয়ে সাহেবকে আপন করে নিল।

ফুটের এই শয়তানীটা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারল না বিনায়ক। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পেত তার জ্বলজ্বলে রক্তাভ চোখের মধ্যে একটা দৃঢ় সংকল্পের ছায়া।

বাইরে ঝড়-বৃষ্টি সমানে চলছে। ঘণ্টাখানেক ধরে আকণ্ঠ মদ্যপান করল দুজনে। আসতে আসতে মদের নেশায় দুজনে এক আত্মা এক প্রাণ হয়ে উঠল। বিনায়কের মনের মধ্যে একটা রাজকীয় ভাব ফুটে উঠতেই উঠে দাঁড়িয়ে জড়িত কণ্ঠে বলল, মাই ডিয়ার ফুট, আমি হচ্ছি ইণ্ডিয়ান কিং। এই নিন আপনার মোহর আর আমার মোহর। দুটোই আপনাকে দিলাম। বলেই মোহর দুটো টেবিলে রেখে যেতে গিয়ে ফিরে তাকাল। আমি চললাম, কাল সকালে সব মোহর বার করে আমাকে দেবেন কেমন ?

নিশ্চয় দোব। আপনার মত বন্ধু পেয়ে আমি গর্বিত।

আপনি আমাকে যখন বন্ধু বললেন, তা হলে সব মোহরই দিয়ে দিলাম। কথাটা বলেই মুহূর্তে পলাতক আত্মার মত নিঃশব্দে বৃষ্টি মাথায় করে হোটেলের গেট পার হয়ে চলে গেল সে।

এ অবস্থায় বিনায়ককে বেরিয়ে যেতে দেখে মিঃ দত্ত খুবই আশ্চর্য হলেন। একটা কৌতূহল নিয়েই মিসেস দত্ত বললেন, ভদ্রলোককে একটা ছাতা দেওয়া উচিত ছিল।

দিবাকর বলে উঠল, ও কাজটি করবেন না মা। এক্ষুণি উল্টো বুঝবে।

তা উনি ওদিকে যাচ্ছেন কেন ?

এ অবস্থায় বাড়ি যাবে না।

যাক গে ওপরে গিয়ে সাহেবকে একবার দেখে এস।

সাহেব ঠিক আছে।

এখন বুঝলে তো বিনায়ক কেন ওপরে গেছল। মানিকে মানিক চেনে। কথাটা বলেই স্ত্রীর দিকে তাকালেন মিঃ দত্ত।

রুবী বলল, আচ্ছা দিবাকর, তোমাদের ওই বিনায়ক বাবুটি কেমন লোক বল ত ?

খুবই রহস্যময়। যা বলেন, তা করেন না। আবার যা করেন তা বলেন না। দিবাকর বেরিয়ে গেল। সকলে হেসে উঠল তার কথা শুনে। কিন্তু সেই মূহূর্তেই ওদের হাসি মুখে, এক তাল কালি ছিটিয়ে দিয়ে গেল একটা উন্মত্ত বাতাস। ঝড়ের আঘাতে জানলার কাচগুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেংগে গেল। তীব্র বেগে ঝলকে ঝলকে জলের ঝাপটা হু হু করে ঘরে ঢুকে আসবারপত্তের ওপর আছড়ে পড়ল। আর তা দেখে ওরা দিশাহারা হয়ে পড়ল সকলে।

দুপুরের আহার শেষে বেশ একপ্রস্থ ঘুমিয়ে নিল সাহেব। কারণ এ অবস্থায় ঘর থেকে বেরুনর কোন উপায় ছিল না। তবু কিন্তু তার অবচেতন মনের গহ্বরে যে ভৌতিক ভীতি নিহিত আছে, সেটাই স্বপ্নের মত অনুভব করছে। ও বেশ বুঝতে পারছে ভূত বা অপ্রাকৃত ঘটনা মানুষের স্নায়ুতে শিহরণ জাগাতে সক্ষম। যে যাই বলুক এই ভূত শব্দটা শুনলেই মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হতে বাধ্য। বিশেষ করে যারা ভূত বিশ্বাস করে না তাদেরই ভূত সম্বন্ধে আগ্রহ বেশি। মিঃ ফ্লুটের অবস্থাও তাই। বিশ্বাস না করলেও ভূতের ভয়ে অস্থির।

নেশার ঘোর কাটেনি। মাঝে মাঝে খুটখাট শব্দ শুনলেই চমকে চমকে উঠছে সাহেব। এ অবস্থাতেই টলতে টলতে জানলায় তাকিয়ে দেখল বৃষ্টি থামলেও আকাশ গম্ভীর। মনে মনে বিরক্ত হ'ল এবং করিডোর পার হয়ে ছাদে উঠে গেল। চিন্তান্বিত ভাবেই পায়চারি করতে করতে বিড়বিড় করে বলল, এখন কি করা যায়? চলে যাওয়াই মনস্থ করল সাহেব। হ্যাঁ আজ রাতেই পালাব। সিদ্ধান্তটা যখন পাকা তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে গিয়েই কি যেন দেখে ওর মুখটা আকস্মিক আবেগ শূন্য হয়ে গেল। সংগে সংগে উদ্বিগ্ন চিত্তে নিচে নেমে এল সাহেব।

আবার বোধহয় বিষ্টি নামল। আবহাওয়াটা বিশ্রি লাগছে। ভাবল এ অবস্থায় বিনা মিত্তির আর আসতে পারবে না। উঃ, ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক লোক ওই বিনামিত্তির। নেশার ঘোরে নবাবী মেজাজে চলে গেলেও মোহরের কথা মনে পড়লে আবার যে আসবে না কে

বলতে পারে—

বেয়ারা চা দিয়ে গেল। চায়ের কাপে ঠোঁট রেখে ক্ষীণ হাসি হাসল ফুট। পরমুহূর্তেই ওর মনে ভীষণ একটা নিঃসঙ্গতার ভাব ফুটে উঠল। এখন একজন সঙ্গী থাকলে ভাল হ'ত। যাই হ'ক, বর্ষামুখর দিনটা ঘুমিয়ে আর বই পড়ে কাটিয়ে দিল সে।

আবার সন্ধ্যা নামল ভূত-কুঠিতে। আস্তে আস্তে অন্ধকারের ছায়া এসে গ্রাস করে ফেলতে লাগল বাড়িটাকে। ঘরের ভেতর আসবাবপত্তর গুলোকে অশরীরী আত্মা বলে মনে হতে লাগল ফুটের। বিশেষ করে লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় পরিবেশটা রহস্যময় হয়ে গত রাতের ঘটনা-গুলো এখন ওর মনে অস্থির উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। হঠাৎ একটা শন্ শন্ শব্দে সতর্ক দৃষ্টিতে জানলায় তাকিয়ে দেখল একখণ্ড সামুদ্রিক ঝড় বন্য পশুর মত নখদন্ত বিস্তার করে বাড়িটার দিকে ছুটে আসছে। ঝড়ের আঘাতে উত্তাল ঢেউগুলো ডাকিনীর মত সোঁ সোঁ শব্দে আছড়ে পড়ছে। দেখতে দেখতে ঝড়টা এসে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করল বাড়িটাকে। অন্ধকারে থর থরিয়ে কেঁপে উঠল সারা বাড়িটা। মড় মড় শব্দে মৃত ঝাউগাছটা মুখ থুবড়ে পড়ল গেটের ওপর। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে হোটেলের লোকজন।

মিঃ দত্ত এই অবস্থাতেই ফুটকে দেখতে ওপরে গেলেন।

কিন্তু মিঃ দত্তকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ফুট বলে উঠল, কিছু ঘটেছে নাকি? সব নিরাপদ তো?

হ্যাঁ। আপনি কেমন?

ঠিক আছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

কথা শেষ হতেই দ্রুত নিচে নামলেন মিঃ দত্ত। আর ফুট ভাবল মোহর তো গাছের গোড়ায় পোঁতা আছে। বেরিয়ে পড়ে নি তো। অথবা সুড়ঙ্গের মুখ যদি বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে কি করে উদ্ধার করব?

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল ফুট এবং অস্থির ভাবেই পায়চারি

করতে লাগল। পরক্ষণেই পরিস্থিতিটা বোঝার জন্য নিচে নেমে গেল।

রাত দশটা। বেয়ারা রুটি আর মাংস রেখে গেছে। আহারে মনসংযোগ করল ফুট। তারপর একপ্রস্থ ধূমপান করে জিনিসগুলো গোছাতে লাগল। কারণ মোহরগুলি উদ্ধার করতে পারলে বেশিক্ষণ হোটেলে থাকা ঠিক নিরাপদ হবে না। নিখুঁত ভাবে জিনিসপত্তর গুছিয়ে বালিশের নিচে মোম দেশলাই টর্চ রেখে শুয়ে পড়ল। কারণ হোটেলের লোকগুলো এখনও জেগে আছে। আজ ও খুবই সচেতন। গত দু রাত্রির ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেজন্য জেগেই আছে। বৃষ্টিটা আবার থেমে আরম্ভ হ'ল। কোথায় যেন একটা বজ্রপাত হ'ল ; সমস্ত বাড়িটা গম্‌গম্ করে কেঁপে উঠার সাথে সাথেই এক ঝলক তীব্র আলো একমুহূর্ত, সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে পরক্ষণেই সব কিছু কে যেন অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে গেল।

ফুট উঠে বাথরুমের দিকে যেতে গিয়ে থমকে গেল। কি যেন ঠেকল পায়ে। টর্চের আলোয় জিনিসটা দেখতে চাইল কিন্তু পেল না। মনে মনে ভাবল তা হলে কি আবার সেই নিদারুণ বিভীষিকাময় সময় ঘনিয়ে আসছে। আবার কি সমস্ত স্নায়ুগুলোকে অসাড় করে দেবে সেই অদৃশ্যশক্তি। কয়েক পা এগিয়ে গেল আর তখনই কে যেন ছুঁচ ফুটিয়ে দিল ঘাড়ে। উঃ, শব্দ করে অন্ধকারেই ঘাড়ে হাত দিয়ে

জিনিসটা তুলে টর্চের আলোয় দেখল, ছুঁচ নয় মেয়েদের মাথার কাঁটা। আকস্মিকভাবে মাথার কাঁটা তার ঘাড়ে কে ফোটাল? কেউ তো নেই। মনে ভীষণ ভয় হ'ল। ক্ষিপ্রবেগে কাঁটাটা ফেলে দিয়ে দরজার দিকে ছুটতে লাগল ফুট আর তখনই বিস্ফারিত চোখে দেখল কিচ্ কিচ্ শব্দ একটা ছায়া যেন করিডোরের দিকে গিয়ে হাওয়ার সাথে মিলিয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে ফুট যখন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তখনই সে আশ্চর্য হয়ে দেখল সেই গাছটার সামনে মোহরের স্তূপ।

এক ঝলক ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেল। সমস্ত পরিস্থিতিটা চিন্তা করে মনকে শক্ত করার চেষ্টা করছে ফুট। একটু পরে সংযত হয়ে বিভ্রান্তঅবস্থা কাটিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। আর একবার তাকিয়ে দেখল চারদিকটা— না কেউ নেই। হোটেল বাড়িটাকে এখন প্রেতপুরী বলেই মনে হচ্ছে। মোহরের দিকে আর একটু এগিয়ে যেতেই একটা উত্তেজনায় শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল ফুটের। মৃদু মৃদু ঘাম ফুটে উঠল তার কানের পাশে। কাঁপা কাঁপা আলোয় আরো ঝুঁকে সুড়ঙ্গের মুখে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দুটো বরফ শীতল হাত পেছন থেকে কে যেন চেপে ধরল তাকে। সেই অদৃশ্য হাতের স্পর্শে তখন ওর মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে একটা কন্‌কনে ঠাণ্ডা বরফের স্রোত বইতে লগল। ও চিৎকার করে বাইরে ছিটকে বেরুল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল। রেলিং ধরে একটু দাঁড়াল। আর তখনই মনে হ'ল স্নায়ুগুলো নিস্তেজ হয়ে ধমনীর রক্ত জমাট বেঁধে যাচ্ছে তার। নিষ্ঠুর আতংক আর ব্যর্থশ্রমের ফলে হাত পা অবশ হয়ে যাচ্ছে; তবু আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে যেই দাঁড়িয়েছে, কানে এল খিল্ খিল্ হাসির আওয়াজ। চকিতে তাকাল ঘরের ভেতর দেখল লাঠি হাতে মড়ার মাথার ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে এক জীবন্ত কংকাল। তাকে জড়িয়ে এক বিষধর সাপ কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে সরু চেরা জিভ দিয়ে যেন তাকে লেহন করতে চাইছে।

একমুহূর্তে ফুট সাহেবের মাথার চুলগুলো তুলোর মত সাদা হয়ে গেল। নীল চোখে এক ঝলক তাকিয়ে জীবন্ত কংকালটা মড়ার

মাথার খড়ম পায়ে খটখট শব্দে ফুটের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তস্বরে ভূত কথাটা বলেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মিঃ ফুট। অত্যন্ত পৈশাচিকভাবে মৃত্যু তাকে মুহূর্তে গ্রাস করে ফেলল।

সকালে বেয়ারা চা দিতে এসে সাহেবের অবস্থা দেখে মিঃ দত্তকে খবর দিল। মিঃ দত্ত ওপরে এলেন। খবর ছড়িয়ে পড়ল অনেকের কাছে।

নলিন, ভজন, বিনায়ক এসে বলল, ডাঃ অগ্নীশ্বর মুখুজ্যেকে ডাকা দরকার।

ডাক্তারবাবু আছেন। ডাক্তারবাবু—

কে?

আমি নলিন। হোটেলে সাহেব বোধ হয় মারা গেছে। একবার এখুনি যেতে হবে।

নলিন আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। সাহেবকে পরীক্ষা করতে গিয়েই দেহটা চিৎ করলাম। অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা কাৎ হয়ে পড়ল। আর, কি আশ্চর্য তার হাতের মুঠোয় দুটো মোহর! সাহেবের হাত থেকে মোহর দুটো নিয়ে ব্যাগে রেখে বেরিয়ে গেলাম। মেঘের বুকে বিদ্যুতের শব্দের মত, নারী কণ্ঠের কান্নায় ডিসেন্ট হোটেল গুমরে গুমরে কেঁদে উঠল। আমি যাবার চার ঘণ্টা আগেই মিঃ ফুট মারা গেছলেন।

আত্মার কক্ষ

আবার একটা বজ্রপাত।

বজ্রপাতের পরমুহূর্তেই বিদ্যুতের আলোয় চোখ দুটো যেন ঝলসে গেল। রাস্তার দু'পাশের অতিকায় চেহারার প্রাচীন গাছগুলোর শাখা-প্রশাখা ঝড়ের মত্ততায় এ:ক অন্য:কে সপাসপ শব্দে চাবুক মারছে।

গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিলাম। ঝড়ের গোঙানি আর, ইঞ্জিনের করুণ আর্তনাদে আমার রক্তের চাপ যেন বেড়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যেই অরণ্য অতিক্রম করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবার জন্য প্রচণ্ড উত্তেজনায় প্রতিটি মুহূর্তে কেটে যাচ্ছে আমাদের।

ঝড়ের মধ্যে আবার বজ্রপাত হল, এবং বিদ্যুতের আলো মিলিয়ে যেতে না যেতেই একদলা কাদা জল ছিটকে এসে গাড়ির সামনের কাচটা ঢেকে দিল। জোরে ব্রেকের উপর চাপ দিতেই গাড়িটা বাঁ দিকে কাত হয়ে থেমে গেল। একটা আচমকা ঝাঁকুনিতে আমার ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেড়ে পড়ল জয়ন্তী। তারই মাঝে আস্পষ্ট অথচ ভয়ার্ত স্বরে জয়ন্তী বলল, উঃ, কি অন্ধকার!

আমি ওর কথাটা শুনেও যেন শুনলাম না। কারণ গাড়ির তীব্র আলোয় কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম।

জয়ন্তী শান্ত কণ্ঠস্বরে বলল, এই দুর্যোগের মধ্যে গভীর অরণ্যে এক মুহূর্তে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

ওর দিকে তাকালাম। দেখালাম অনাবশ্যক একটা ভয়ে ওর চোখ মুখ বিশীর্ণ করুণ।

হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলেছ। কিন্তু তুমি বোধহয় কল্পনাও করতে পারবে না সামনের ওই রাস্তাটা কি ভয়ংকর পিচ্ছিল আর কর্দমাক্ত। শুধু তাই নয় এই অরণ্য পথের দু-ধারের শ্যাওলা আর পাঁকেভরা ঝিলগুলো কী কুৎসিৎ গভীর। তাছাড়া মাইলের পর মাইল এই জংগলের পথটা এ অবস্থায় অতিক্রম করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

হ্যাঁ। তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু···

আমি বুঝলাম জয়ন্তী কি বলতে চাইছে। কাজেই আবার গাড়িতে ষ্টার্ট দিলাম। WBP 2112 নাম্বারের ফিয়েট আবার জলকাদা কেটে কেটে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল, যেন থকথকে জমাট রক্তের সমুদ্রের মধ্য দিয়ে আমরা এগোচ্ছিলাম।

আবার একবার বিদ্যুৎ চমকাল। আর তখনই বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম রুকন্ পাহাড়ের কাছাকাছি বিক্ষুব্ধপত্র শাখার আড়ালে

দাঁড়িয়ে আছে জরাজীর্ণ বিশাল একটা প্রাসাদ।

কোন কিছু না ভেবে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিলাম। যদিও অজানা ওই প্রাসাদে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না।

তুমুল বৃষ্টি আর ঝড়ের হাওয়া ভেদ করে তীব্রবেগে গাড়িটা এনে থামালাম একেবারে সিঁড়ির শেষধাপের কাছে। ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ শব্দ মুহূর্তে স্তব্ধ হতেই গাড়ি থেকে দুজনে নামলাম। একটা ক্ষীণ হাসি হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরল জয়ন্তী। আলতো চুমু দিয়ে আমি তার হাত ধরে চারধাপের সিঁড়ি পার হয়ে প্রশস্ত বারান্দায় উঠে এলাম।

এক ঝলক তীব্র ঝড়ো হাওয়া আর জলের ছাঁট আঘাত করল আমাদের। আমি জয়ন্তীকে একটা নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে গেলাম। কি করব ভাবছি। এ প্রাসাদে কোন মানুষজন আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

বাইরের দিকে তাকালাম। দেখলাম আকাশে অন্ধকার আরো ঘন হয়ে আস্তে আস্তে প্রাসাদটাকে যেন গ্রাস করে ফেলছে।

ঝড় বৃষ্টির শব্দ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। নিঃশব্দে দক্ষিণের বারান্দার দিকে এগোতে লাগলাম। আর তখনই লক্ষ্য করলাম জানলার কাচ ভেদ করে একফালি আলো এসে পড়েছে থামের ওপর।

এই পোড়ো প্রাসাদে মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করে মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

আমরা আরো কয়েক পা এগিয়ে সেকেলের তৈরি বিরাট একটা দরজার সামনে দাঁড়ালাম। কড়া নাড়লাম কিন্তু ভেতর থেকে কারো কোন সাড়া পেলাম না। দরজার পাল্লায় হাত রেখে জয়ন্তীর দিকে তাকালাম। আর তখনই মনে হল পাল্লা দুটো আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। ভেতরে প্রবেশ করার জন্যে সবেমাত্র চৌকাঠ অতিক্রম করেছি মুহূর্তে কান বধির করা বিকট একটা শব্দে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে

দুজন দুদিকে ছিটকে পড়লাম। পরমুহূর্তে লক্ষ্য করলাম বিস্ফারিত চোখে একটি মধ্যবয়স্ক বিকট চেহারার লোক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথার চুল ধূসর পাতলা, জীর্ণ কালো পরিচ্ছদ এবং খোচা খোচা দাড়ি। লম্বায় ছ ফুটের মত। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। হাতে একটা সরীসৃপের কংকাল।

লোকটাকে দেখার পর থেকে কেমন যেন একটা ভয়ে আমার পা দুটো ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। জয়ন্তীর কণ্ঠে একবার মাত্র একটা গোঙানির শব্দ শোনা গেছল—তারপর থেকে সে চোখ বন্ধ করে আমাকে জড়িয়ে আছে।

লোকটি আরো কাছে এগিয়ে এল এবং আমাদের আপাদমস্তক দেখে বলল, ভেতরে আসুন। ভেবেছিলাম সেই শয়তানগুলো বুঝি আবার এসেছে।

লোকটির কথায় খুবই অবাক হলাম এবং ঘরের ভেতর গিয়ে তার ইংগিতেই চেয়ারে বসলাম। আমরা বসতেই লোকটি অন্য ঘরে চলে গেল। আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলাম তার গতিবিধি।

একটু পরেই আর একটি যুবতী এসে দাঁড়াল। যুবতীটিকে চেনা বলে মনে হলো। রাশভারী চেহারা, গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ, কপালের ডান দিকে একটা কাটা দাগ এবং স্থির চোখ।

যুবতী আরো কাছে এগিয়ে আসতেই আমি তার মুখ দেখে চমকে উঠলাম। ভয়ে সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল।

যার মুখ দেখে বুক কেঁপে উঠল সে আর কেউ নয় একটি মৃত যুবতী—

আজ থেকে চার বছর আগে মিষ্টার দত্তের ডিসেণ্ট হোটেলে রহস্যজনক ভাবে মারা গেছল সে। আমিই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে ছিলাম।

আমার মানসিক অবস্থাটা হয়ত বুঝতে পেরেছে যুবতীটি। তাই মুখে মৃদু হাসির রেখা টেনে অভিবাদনের ভংগিতে মাথাটা নোয়াল এবং

অপলক দৃষ্টিতে জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন ? তবে একটা কথা বলে রাখি 'ভয়ই মানুষের শত্রু—'

কথাটা শেষ করেই হঠাৎ বিশ্রিভাবে হেসে উঠল যুবতী। আর সেই মুহূর্তেই বাইরে অন্ধকারের বুকে কে যেন সপাং করে একটা চাবুক বসিয়ে দিল।

আবার শুরু হ'ল ঝড়ের তাণ্ডব।

ঘরে এসে ঢুকল প্রথম যাকে দেখে ছিলাম সেই লোকটি। তাকে দেখে বাঁকা চোখে তাকিয়ে যুবতী বলল, আমার অতিথিদের থাকার ঘরে পৌঁছে দাও।

লোকটি কাঁপতে কাঁপতে বিশ্রি ভংগিতে দেহ দুলিয়ে আর একবার আমাদের দেখল এবং সঙ্গে আসতে অনুরোধ করল।

আমরা দুজনেই প্রায়ান্ধকার হলঘর পার হয়ে তার পিছু পিছু অন্য একটা ঘরে ঢুকলাম। সুসজ্জিত আরামদায়ক শয্যাসহ ঘরটি দেখে এত খুশি হলাম যে তাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না। শুধু তাই নয়, এমন একটা সাংঘাতিক ভয়ার্ত কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পরও সুন্দর কক্ষটি দেখে জয়ন্তীও না হেসে পারল না। একটু পরে লোকটিকে সে বলল, আপনাদের আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ।

জয়ন্তী কথা শুনে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সাথে সে মাথা নোয়াল। কিন্তু তার চোখে মুখে কেমন যেন বিষণ্ণের ছায়া।

নীরবতা ভংগ করে বললাম, দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার জন্যে এ প্রাসাদে ঢুকে পড়েছি। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই কেমন যেন একটা অঘটনের ইংগিত পাচ্ছি।

কথাটা শেষ হবার আগেই লোকটি বিস্ফারিত চোখে তাকাল। তার চোখে মুখেও এক অজ্ঞাত বিভীষিকার ছায়া স্পষ্ট জেগে উঠেছে।

বললাম, আশাকরি আমাদের ক্ষমার চোখে দেখবেন।

তার উত্তরে লোকটি দৃষ্টি সরিয়ে আমার ঘাড়ের কাছে মুখ রেখে বলল, বাঃ ! আপনার স্ত্রী তো বেশ সুন্দরী ! কথাটা শেষ হতেই একটা কুটিল গোপন হাসির রেখা তার মুখে জেগে উঠে ছায়ার মত

মিলিয়ে গেল।

আমি বোবা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। হঠাৎ জয়ন্তী ভয় এবং জড়তা কাটিয়ে বেপরোয়া ভাবে লোকটিকে প্রশ্ন করল, আপনি কে জানতে পারি কি?

লোকটি বলল, ডিনারের সময় সব জানতে পারবেন। কথাটা বলেই একটা নিস্তেজ বিবর্ণ হাসি হেসে দ্রুত চলে গেল সে। মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে দরজার পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল।

দরজা-বন্ধ ঘরের ভেতর আমরা দুজনে এখন সম্পূর্ণ একাত্ব হয়ে শয্যার উপর বসলাম। জয়ন্তী আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে ছিল। শরীরের অভ্যন্তরের কোষগুলোও নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল তার। কাজেই ব্যাগ থেকে হুইস্কির বোতল বার করে দুজনে কয়েক বেগ হুইস্কি পান করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে উঠল।

কাচের দীপাধারে মোটা একটা মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির শিখাটা মাঝে মাঝে থির থির করে কেঁপে কেঁপে উঠছে, কখনও বা হেলে পড়ছে। অদ্ভুত লাল আলোর শিখায় ঘরের অভ্যন্তরটাকে একটা ভাসমান হৃদপিণ্ড বলে মনে হচ্ছে।

একটা জঘন্য জায়গায় বোধ হয় আশ্রয় নিয়েছি। কথাটা বলল জয়ন্তী।

বললাম, তোমার অনুমান সত্য কিন্তু তোমার কি আর কিছু মনে হয় নি?

কই না তো? তবে লোকটার চালচলন কথাবার্তা যে স্বাভাবিক নয়, তা বুঝতে পেরেছি। আসলে লোকটা শয়তান ছাড়া কিছু নয়।

তোমার কথায় এক মত হতে পারলাম না।

কেন?

যুবতীটিকে আমি চিনি। কিন্তু সে আমাকে কোনদিন দেখে নি

অথচ এমন ভাবে কথা বললে যে সে আমার পরিচিত।

তুমি হয়ত ভুল করছ। হয়ত তোমার সেই চেনা যুবতীটির সাথে এই মহিলাটির মিল থাকতে পারে?

কিন্তু এটা হল গিয়ে···কথাটা বলতে গিয়েই একবার ঢোক গিললাম। ভাবলাম মৃত যুবতীর প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল। তা ছাড়া ব্যাপারটা আমার কাছে বাস্তব সত্য হলেও নিশ্চয়ই ও অবাস্তব ভাববে। এ ক্ষেত্রে আর কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকাই ভাল কারণ ডিনারের সময় তো হয়ে এল।

আমি যখন গভীর চিন্তায় মগ্ন ঠিক তখনই জয়ন্তী নীরবতা ভঙ্গ করে বেশ উত্তেজনার সাথেই বলল, যাই হোক, তুমি যে এমন একটি বাড়ির আবিষ্কার করেছ তাতেই আমি খুশি।

গম্ভীর আগ্রহ নিয়ে জয়ন্তীর দিকে ঝুঁকে বললাম, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমরা বোধহয় মৃত্যুর গহ্বরে প্রবেশ করছি।

কি যে সব আজে বাজে বকছ।

আমি সিগারেট ধরালাম এবং তারই ফাঁকে লক্ষ্য করলাম একটা বিশেষ সুখের উৎসের দিকে জয়ন্তীর মন এগিয়ে যাচ্ছে। চোখে মুখের সলজ্জ ভাবটা সুচতুর ভাবে আমাকে আকর্ষণ করছে। বুঝলাম হুইস্কির ক্রিয়াতেই ওর অন্তর পুলকিত হয়ে উঠেছে এবং তা বেড়ে যাচ্ছে।

আরো নিবিড় ভাবে দেহটাকে আমার বুকের কাছে রাখল জয়ন্তী আর তখনই আমি অনুভব করলাম জয়ন্তী সত্যি অপূর্ব সুন্দরী। এবং সত্যিকথা বলতে কি এ রকম মনোহারিণী যুবতীকে স্ত্রী রূপে পেলে নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মনে করতাম।

আমি কোলের কাছে জয়ন্তীর মুখটা টেনে নিয়ে আর একবার ভাল করে দেখলাম। সত্যি একটা আভিজাত্য আর কৌলিণ্যের ছাপ ওর সারা অঙ্গে বিরাজ করছে।

জয়ন্তী পট্টনায়েক।

ওড়িয়া চলচ্চিত্রের নামকরা নায়িকা জয়ন্তী। এখন সে প্রডিউসার : সুন্দরগড়ের বাসিন্দা। কলেজে পড়ার সময় প্রথম বন্ধুত্ব। সে বন্ধুত্ব দিনে দিনে আরো গাঢ় হয়েছে কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব কারো মুখ থেকেই প্রকাশ পায় নি।

কারণ আমার ডাক্তার হওয়াটা কোনদিনই ওর পছন্দ ছিল না। বিশেষ করে ডাক্তারদের সম্বন্ধে ওর একটা ধরাণা, ডাক্তাররা নাকি স্ত্রীর প্রতি উদাসীন থাকে। হয়ত কোন পরিচিত ডাক্তারের চালচলন চরিত্র দেখেই খুব সম্ভব ওর এ ধারনাটা জন্মেছিল কিন্তু আমার প্রতি ওর যে একটা আকর্ষণ আছে তা আমি জানতাম।

সত্যিকথা বলতে কি ও যখন পড়া ছেড়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে গেল তখন আমিও ওকে খানিকটা সন্দেহের চোখে দেখে ছিলাম এবং ওর বিষয়ে উদাসীন ছিলাম।

প্রায় বছর চারেক ওর সাথে আমার কোন যোগাযোগই ছিল না। কিন্তু গতকাল হঠাৎ ও যখন আমার বাড়িতে এসে আমার কাহিনী নিয়ে ছবি তৈরি করতে চাইল, তখন খুশিই হয়ে তার সফলতা কামনা করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলাম।

কাজেই ও যখন স্যুটিং স্পট অনুসন্ধানের জন্য সঙ্গে যেতে অনুরোধ করল, তখন না করতে পারলাম না।

সকালে যখন পুরী থেকে ওকে নিয়ে সুন্দরগড়ের পথে রওনা হলাম তখন আবহাওয়া পরিষ্কার ছিল কিন্তু ভুবনেশ্বর অতিক্রম করার পর থেকেই আকাশ গভীর কালো মেঘে ঢেকে যেতে লাগল। আমাদের পরিকল্পনা ছিল সম্বলপুরে একটা রাত কাটিয়ে পরের দিন সুন্দরগড় রওনা হব। কিন্তু ঝির ঝিরে বৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়া মেঘলা আকাশ, আর অস্বচ্ছ আলো, প্রতি মুহূর্ত গাড়ির গতি কমিয়ে দিচ্ছিল। কাজেই রাত আটটা পর্যন্ত একটানা গাড়ি চালিয়েও যখন গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারলাম না এবং বজ্রের শানিত ছুরি আর বৃষ্টির চাবুক যখন আমাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে তখন বাধ্য হয়েই বাঁচার পথ খুঁজতে গিয়ে অবিশ্বাস্য ভাবে এ প্রাসাদটাকে দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়েছি। কিন্তু

এখন মনে হচ্ছে মৃত্যুর গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে যেন কফিনের মধ্যে প্রবেশ করেছি।

দুজনে কথা বলতে বলতে আরামদায়ক শয্যায় দেহ এলিয়ে আনন্দের চরম সীমায় যখন এগিয়ে যাচ্ছি ঠিক তখনই জয়ন্তী বলল, তোমার গল্প নিয়ে ছবি করার ইচ্ছেটা যে কোনদিন বাস্তবে রূপ দিতে পারব ভাবি নি। আমি এ বাড়িতেই সুটিং করব। বিশেষ করে তোমার ভূতুড়ে গল্পের সাথে এ বাড়ির পরিবেশটা বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছে, তাই না?

কথাটা শেষ করেই মুখের দিকে তাকাল জয়ন্তী। ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর এলোমেলো কোঁকড়ান কালো চুলের ভেতর থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ আমাকে মাতাল করে তুলল। বললাম চমৎকার!

কি চমৎকার?

তোমার বক্তব্য। এবং তার থেকেও চমৎকার একটা সুমিষ্ট গন্ধ যা তোমার কেশ থেকেই সম্ভবত ভেসে আসছে।

সত্যি তুমি ভীষণ বোকা। তুমি তো জান আমি কোনদিন গন্ধ জিনিস ব্যবহার করি না।

তাহলে গন্ধটা আসছে কোথেকে?

আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তা হলে নাও শুঁকে দেখ তো। এক রকম জোর করে আমার বুকে মাথাটা গুঁজে দেয় জয়ন্তী।

না। সে রকম কোন গন্ধ পেলাম না। একটু আশ্চর্য হলাম। আর সেই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল একটি রুগীর কথা। নাম বিনায়ক মিত্র। একটা পচামড়ার গন্ধ তার দেহ থেকে ভেসে আসত। আমি তাকে সারাতে পারি নি। পরে জেনে ছিলাম সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল ভৌতিক কাণ্ড।

জয়ন্তীর কথায় ভাবনা ভেংগে গেল। নাক কুঞ্চিত করে সে বলল, প্রচীন এ প্রাসাদগুলোর একটা কি অসুবিধে জান, এর বিশাল খোপে খোপে অবৈধ বসবাসকারী সরীসৃপ আর পাখিদের

দেহের এবং মলের গন্ধে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে যায়। সেটাই স্বাভাবিক, কাজেই কোন মিষ্টি গন্ধের কথা বলা একটা বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম তার আগেই দরজার বাইরে থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথেই লক্ষ্য করলাম লোকটির হাতের স্পর্শে বন্ধ দরজা খুলে গেল। লোকটি কাছে এসে আমাদের ডিনারে আমন্ত্রণ জানাল।

জয়ন্তী তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে পোশাক বদলে এসে দাঁড়াতেই দুজনে বেরিয়ে গেলাম। বেশ উত্তেজনা নিয়েই আলোছায়া অন্ধকারে করিডোর পার হয়ে ডাইনিং হলে এসে দাঁড়ালাম। এবং কোন লোককে দেখতে না পেয়ে একটু বিস্মিত হলাম। এ অবস্থায় ওদের প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। হঠাৎ খেয়াল হল গাড়ির ভেতর থেকে টর্চলাইটটা আনা হয়নি। জয়ন্তীকে বললাম, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি টর্চলাইটটা নিয়ে আসি।

আমার কথায় কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করল জয়ন্তী। বলল' চল না, এক সাথেই যাই।

বাইরে এসে দেখলাম আকাশ পরিষ্কার। দুর্যোগ কেটে গেছে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে গাছের পাতায়। মনে হচ্ছে বিশ্ব চরাচর স্তব্ধ হয়ে গেছে।

জয়ন্তী ফিস ফিস করে করে বলল, দেখ তো! গাড়ির ভেতর কে যেন একটা লোক বসে আছে মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ। সত্যিই তো!

লোকটি বোধ হয় আমাদের কথা শুনতে পেয়েছে। আমরা যখন তাকে লক্ষ্য করছি সে তখন গাড়ির বাইরে এল এবং মাথা নত করে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল। সেই মুহূর্তে লোকটির মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব লক্ষ্য করলাম। গাড়ির সামনের দিকে সিলিংয়ে ঝোলান

রেশমী চুলের পুতুলটা নিয়ে নাড়া চাড়া করছে সে।

এ ভাবে কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার পর খুব দ্রুত সে আমাদের দিকে এগিয়ে এল এবং অস্বচ্ছ আলোয় এক ঝলক জ্বলন্ত দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে ডাইনিং হলের দিকে ছুটেতে লাগল। বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে আমরাও তার পিছু পিছু ছুটলাম লোকটির এই অলৌকিক ভাবভঙ্গি যে আমাদের খুব ভাবিয়ে তুলে ছিল, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এবং সে যে ভয়ে ছুটছে এটা আমরা বুঝে ছিলাম। সব থেকে বড় কথা লোকটা যদি কিছু বলত বা ক্ষমা চাইত তা হলে সমস্ত ব্যাপারটা আমি ভুলেযেতাম কিন্তু লোকটাকে ধরতে না পারাতেই আমাদের রাগ বেড়ে গেল।

জয়ন্তী বলল, এ প্রাসাদের মালিকই বা কি ধরনের মানুষ!

আমি বললাম, মালিক যে ধরনেরই হোক না কেন. তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। কিন্তু দুর্যোগের মধ্যে যে আশ্রয় পেয়েছি তার জন্য তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নয় কি?

একটা নকশাকাটা কাচের দীপাধারে সজ্জিত মোমের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়ছে ডাইনিং হলে। আর ঠিক হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে লোকটি। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সে একবার দৃষ্টি বিনিময় করল এবং অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। হঠাৎ যুবতীটি ডাইনিং হলে প্রবেশ করে আমাদের তিনজনকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু যেন অপ্রস্তুত হল, এবং মুহূর্তে মনের ভাবটা কাটিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে লোকটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আচমকা

একটা ঘুঁষি মারল। ঘুঁষিটা খুব সম্ভব লোকটির চোয়ালে লেগেছিল তাই হাত দিয়ে চোয়ালটা চেপে ধরে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল লোকটি।

আমি দুঃখিত। মাফ করবেন আমার আশ্রিত ওই লোকটি অত্যন্ত নির্বোধ। যুবতী দেখলে ওর কোন মাথার ঠিক থাকে না। বসুন।

আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি একবার তাকালাম এবং দুজনে প্রায় একসাথেই ডিনার টেবিলে গিয়ে বসলাম। যুবতীটি আমাদের মুখোমুখি বসল।

লোকটা ফিরে এসে খাদ্য পরিবেশন করছিল। লোকটির পরিবেশনের হাতটি খুব পাকা। চীনামাটির পাত্রে পাত্রে রুটি, মাংস, স্যুপ এবং কাচের গ্লাসে মদ। খিদেও ছিল ভয়ংকর কাজেই কথা বলার থেকে খাওয়ার দিকেই আমার মন বেশি আকৃষ্ট ছিল। তবু খাওয়ার মাঝেই লক্ষ্য করলাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যুবতীটি আমাদের দেখছে। হঠাৎ সে বলল. তা হলে এবার সত্য কথা বলুন তো, রূপসী মহিলাটি কি আপনার স্ত্রী?

যুবতীর কথায় চমকে উঠলাম। কারণ এ ধরনের প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিলাম না।

বললাম. আপনার সাথে তো এখনও আলাপই হয়নি। কাজেই···

বুঝেছি। আচ্ছা, বলুন তো প্রথমে আমাকে দেখে এত ভয় পেয়েছিলেন কেন?

আমার এক পরিচিত মৃত মহিলার সাথে আপনার মিল দেখে।

হ্যাঁ। ঠিক তাই। এবং খুব সম্ভব আপনার সেই পরিচিত মৃত মহিলাটির নাম—নিশ্চয়ই নবমী পাণিগ্রাহী?

আপনার অনুমান সত্য।

আমাকে দেখে অনেকেই এ ভুলটা করে। এবং মাঝে মাঝে আমি নিজেই নিজেকে চিনতে পারি না। শুধু তাই নয় আমার শারীরিক পরিবর্তনটা এক এক সময় এমন বীভৎস হয়ে ওঠে যে, সে

দৃশ্য দেখে আমার আশ্রিত জন্মেশ্বরের রক্তেও হিম ধরে যায়।

আপনার সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলে খুশি হবো।

ওঃ, সিওর। নিশ্চয় জানবেন।

আমাদের কথার মধ্যেই জয়ন্তী বলল, এত সুন্দর বাংলা বলছেন যে? আপনি কি বাঙালী?

আংশিক।

সম্পূর্ণ নয় কেন?

মার কাছে যা শুনেছি, আমার বাবা ছিলেন বাঙালী কালাহাণ্ডীর জমিদার। আর মা ছিলেন ওড়িয়া।

ভারি ইন্টারেষ্টিং তো।

হ্যাঁ। ব্যাপারটা কি ঘটেছিল জানেন?

শিকারের খুব শখ ছিল বাবার। একবার মালখানগিরির মাল অঞ্চলে শিকারে গিয়ে খুব বিপদে পড়েন তিনি, তখন একটি ওড়িয়া যুবতী বাবার প্রাণ বাঁচায়। যুবতীর সেবা যত্নে এবং আন্তরিকতায় বাবা বেঁচে ওঠেন কিন্তু কালাহাণ্ডীতে তাকে নিয়ে যাবার সাহস ছিল না তাঁর। কারণটা কি জানেন, বাবার প্রথম বিবাহিত স্ত্রীটি ছিল খুব জবরদস্ত মহিলা। সব ঘটনা শুনে সে বাবাকে স্পষ্ট বলে ছিল, আমি আটগড়ের জমিদার ভুবন সোমের মেয়ে। তুমি ঐ অরণ্য কুহকিনীর মায়া যদি ত্যাগ না কর, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব আর তা যদি না পারি বিষ খেয়ে মরব।

তার উত্তরে বাবা বলেছিলেন, হত্যা বা আত্মহত্যা কোনটাই তোমাকে করতে হবে না, আমি নিজেই সরে যাব।

একদিন সব কিছু পরিত্যাগ করে তিনি মালখান গিরিতে চলে এসেছিলেন, কিন্তু সেখানে ও তার স্থান হয় নি। শেষে বাবার এক বন্ধু এই বাড়ি সহ তিন হাজার গুঠ জায়গা বিক্রি করে স্থায়ী বসবাসের সুরাহা করেদেন। এখন সেই সম্পত্তি, আমি ভোগ করছি। অর্থাৎ এই প্রাসাদের মালিক আমিই।

কথাটা শেষ হতে না হতেই দেখলাম যুবতীর চেহারাটা কেমন যেন

বদলে যাচ্ছে এবং ডাইনিং হলটির মধ্যে ও কেমন যেন একটা অলৌকিকতার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। যা আমি উপলব্ধি করতে পারছি কিন্তু ব্যাখ্যা করার ভাষা খুঁজে পারছি না।

হঠাৎ জয়ন্তীর দিকে তাকালাম। ওর মনের ভাবটা লক্ষ্য করাই ছিল উদ্দেশ্য। আর সেটাই হল কাল। প্রথমত জয়ন্তীকে দেখে এত বিস্মিত এবং শিহরিত হয়ে উঠলাম যে, কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল।

বেশ কয়েক মিনিট কোন কথাই বলতে পারলাম না। জয়ন্তী ও চুপ করে ছিল। আসল ব্যাপারটা হল যুবতীর কথার সাথে সাথে জয়ন্তীর শারীরিক এবং মানসিক ভাবের দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে।

আমার বিস্মিত ভাবটা বোধহয় জয়ন্তী উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই কামনার হিল্লোল জাগান দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মোহজাল সৃষ্টিকারী হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিল সে।

আমি বাঁ হাত দিয়ে জয়ন্তীর দেহ স্পর্শ করলাম, এবং ওর মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলাম। কারণ কোন নারী যে এত সুন্দরী সুশ্রী, হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

আপনারা বিশ্বাস করুণ আমি যা বলছি তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়।

জয়ন্তীর মাখনের মত নরম শরীরে এখন আগুণের উত্তাপ। একরাশ কালো চুল ঘাড়ের পাশ দিয়ে বুকের উপর ছড়ান। তার ফলে মুখায়বের খানিকটা ঢেকে গেছে। টকটকে লাল আঁচলা দেওয়া সম্বলপুরী স্লিকের শাড়ি এবং হাতকাটা ব্লাউজ শোভিত এ মহিলা যে সত্যি জয়ন্তী এই মুহূর্তে তা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

আমি আবার লক্ষ্য করলাম জয়ন্তীর কোমরটা অত্যন্ত সরু। নিতম্ব সুডৌল ও ভারী। সেই সঙ্গে আধ খোলা বুকের অমৃতাধার, দুটি দীপ-শিখার মতই কম্পমান। শুধু তাই নয় রাজহংসীর মত নরম গলার উপর মুক্তার মালাটি তার সৌন্দর্য্যকে আরও আকর্ষনীয় করে তুলেছে ঠিক যেন গ্রীক ভাস্কর্যে-গড়া কোন মূর্ত্তি।

এভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর মৃদু কৃপন হাসির রেখা জেগে উঠল জয়ন্তীর ঠোঁটে। ডিনার টেবিলে বসার সময় যে কৃত্রিম হাসি

চাপল্য এবং উচ্ছাস আমাদের মধ্যে ছিল এখন ততটা নেই। শুধু তাই নয় পারস্পরিক যে অন্তরঙ্গতায় সোচ্চার হয়ে এসেছিলাম তার নাম গন্ধও ওর মধে দেখতে পাচ্ছি না। একটা শোকাবহ কোন ঘটনা শুনলে মানুষের মুখের ভাব যেমন হয় ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে জয়ন্তীকে।

যুবতী বলল, আপনার স্ত্রীকে কেমন দেখছেন?

কথা শুনে ওর দিকে তাকালাম। দেখলাম স্থির দৃষ্টিতে জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে আছে যুবতী।

বললাম, জয়ন্তী আমার স্ত্রী নয়। সঙ্গিনী বা বান্ধবী বলতে পারেন।

কথা শুনে মৃদু হাসল যুবতী। সে হাসি ক্রমে আরো বিস্তৃত হল। বলল, তবু মহিলাটিকে তো এখন আপনি স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে যাচ্ছেন। সে যাই হোক. এ অবস্থায় মহিলাটিকে কেমন দেখছেন?

সম্পূর্ণ অন্যরকম। ও যেন আমার পরিচিত নয়।

ঠিক। আপনার অনুমান সত্য। আপনার বান্ধবীর মধ্যে যাকে দেখলাম সে হচ্ছে আমার আত্মা।

কি বলছেন?

সত্যি কথাই বলছি। আমি অপূর্ব সুন্দরী ছিলাম। আমার রূপে যে কোন পুরুষই মুগ্ধ হ'ত।

আমাদের কথার মধ্যেই জয়ন্তী, মৃদু কোমল অস্ফুট এক অস্পষ্ট উচ্চারণে যা বলল তার একবর্ণ ও আমি বুঝতে পারলাম না। শুধু লক্ষ্য করলাম যুবতী ঘাড়নেড়ে তার কথায় সম্মতি জানাল। তবু আমি সমস্ত ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু সূক্ষ্মবুদ্ধি দিয়ে তার রহস্যের সূত্র খুঁজে পেলাম না।

হঠাৎ একটা বাচনিক যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল. যুবতী এবং জয়ন্তীর মধ্যে। কখনো উচ্চস্বরে, কখনো বা অমার্জিত ভঙ্গিতে একে অন্যকে আক্রমন করছে। জয়ন্তীকেই বেশি উত্তেজিত মনে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে আমি যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছি।

কথার মাঝেই একটা বিসদৃশ ব্যাপার ঘটে গেল। জয়ন্তী উত্তেজিত-

ভাবে স্যুপের পাত্র ছুড়ে ফেলে দিল। মূল্যবান রূপোর পাত্র থেকে স্যুপ পড়ে ডিনার টেবিলের সুদৃশ্য কারুকার্য করা মোটা চাদরটা বিশ্রি হয়ে গেল।

এ ব্যাপারে আমি লজ্জিত এবং বিস্মিত হলেও যুবতী কিন্তু টু-শব্দটি করল না। নিঃশব্দে স্যুপের পাত্রটি টেবিলে রেখে গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল।

আবার খাওয়া শুরু হল। তৃপ্তির সাথেই খাওয়ায় মন দিলাম। যুবতী রাক্ষসের মত মদ আর মাংস শেষ করছে। একমাত্র জয়ন্তীই খাওয়ার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে বসে আছে। শুধু তাই নয় মৌন বিষণ্ণভাবে খাদ্য পানীয়গুলিকে ঘৃণার চোখে দেখছে সে।

ওর নিজের শক্তি, বলতে কিছু নেই। ও এখন আমার ইচ্ছার অধীন।" কথাটা বলে আমার দিকে ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকাল যুবতী। তার কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

বললাম এ সমস্ত গূঢ় রহস্যময় ব্যাপারটার অবসান ঘটিয়ে বক্তব্যটা পরিষ্কার করে বললে খুবই ভাল হয়।

—আপনি কি সমস্ত ব্যাপারটা শুনতে আগ্রহী?

—নিশ্চয়ই।

—তবে শুনুন।

আলোচনা আবার শুরু হ'ল। যুবতী বলতে সুরু করল।

প্রথমেই সে বলল, জয়ন্তীর মধ্যে যে রূপ দেখছেন তা নিখুঁত ভাবে দেখে রাখুন। কারণ হয়ত কোর্টে, ওই চেহারার বর্ণনা আপনাকে দিতে হতে পারে।

একমাত্র সেই কারণেই জয়ন্তীর মধ্যে আমার প্রতিবিম্ব প্রকাশ করে দেখিয়ে ছিলাম—সে সময় আমার চেহারা কেমন ছিল?

কথাটা বলতে বলতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জয়ন্তীর দেহটি জরীপ করতে লাগল যুবতী। জয়ন্তীর দেহের মাঝে আতি পাতি করে ও যেন নিজেকে খুঁজছে।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম তার আগেই সে আমার কথায় বাধা

দিয়ে বলল, আজ থেকে দু'বছর আগে, এমনি এক ঝড়ের রাতে চারজন লোক এসে আশ্রয় চাইল আমার কাছে। তাদের পোসাক পরিচ্ছদ, চালচলন, কথাবার্তা, বেশ অভিজাত বলেই মনে হয়েছিল। সেই মুহূর্তে আমার একবার ও মনে হয়নি যে, অতিথিদের আশ্রয় দিয়ে আমি ভুল করেছি।

আমি যখন তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থায় মগ্ন তখন একজন আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি হেসে পাশের ঘর থেকে, অন্য একজনকে বলল, যে সুবেশা মহিলাকে দেখলাম,—নিশ্চয়ই সে বিবাহিতা নয়।

একজনের কথা শেষ হতেই আর একজনের কণ্ঠ ভেসে এল, ওই মহিলার অন্তরটা উদার। তা না হলে এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত ঘরটি অচেনা অতিথিদেরকেও দিতে পারে?

আর একজন বলল, আসলে মহিলাটি একটি খেয়ালী মেয়ে মানুষ ছাড়া কিছু নয়।

শেষের জন বলল, তোমরা যাই বল মহিলাটিকে কিন্তু আমার কোন দিনই ভাল মনে হয় নি। তা না হলে এই গভীর অরণ্যে রহস্যাবৃত বিশাল এই প্রাসাদে সুন্দরী যুবতী কি কখনও বাস করে? তবে যুবতি যে কুমারী নয় আমি তা জানি।

যথা সময়েই—আমি সব শুনলাম এবং তাদের ডিনারের আমন্ত্রণ জানালাম। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই তারা ডিনার টেবিলে বসল এবং আত্ম পরিচয় দিয়ে বলল, আমরা সকলেই ব্যবসায়ী। জঙ্গল নিলাম নিয়ে বড় বড় শহরে কাঠ চালান দিয়ে থাকি। পাহাড় সংলগ্ন সামনের ওই জঙ্গলটি লিজ নেবার ইচ্ছে আছে। সেই কারণেই সরজমিনে তদন্ত করে দেখতে এসেছিলাম কতগুলো গাছ আছে—এবং লাভ লোকসানের ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়।

কিন্তু আকস্মিক ভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা সকলেই এত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে ছিলাম যে আপনার এখানে আশ্রয় না পেলে হয়ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তাম।

গল্পের মাঝেই আমি একবার জয়ন্তীর দিকে তাকালাম। বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলাম খাবারগুলি সে গোগ্রাসে গিলছে। শুধু তাই নয় তার চেহারা পোসাক পরিচ্ছদেরও একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাকে আগের অবস্থায় দেখে খুশি হলাম এবং বললাম, অত অস্বাভাবিক ভাবে কেন খাচ্ছে জয়ন্তী ?

জয়ন্তী সহজ ভাবেই উত্তর দিল, বড্ড খিদে পেয়েছে।

যে লোকটি খাবার পরিবেশন করছিল সে জয়ন্তীর কথায় অমার্জিত ভঙ্গিতে রুক্ষকণ্ঠে বলল, 'আত্মার কক্ষ।'

যুবতী লোকটির কথায় অসন্তোষ প্রকাশ করে ইংগিতে তাকে সরে যেতে বলল। লোকটি টু শব্দ না করে চলে গেল।

যুবতী আবার শুরু করল ঃ

সেই লোকগুলির কথা শুনে আমি তাদের বললাম, ঈশ্বর কে ধন্যবাদ দিন।
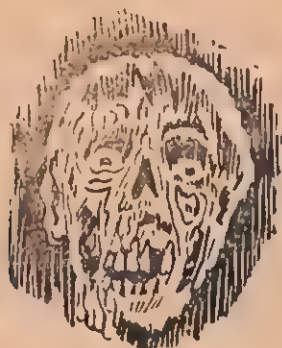
তার উত্তরে একজন বলল, আমরা ঈশ্বর মানি না। বিশেষ করে আজ পর্যন্ত আমার আশা আকাঙ্খায় ঈশ্বর যখন কোন হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেনি, তখন তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সন্দেহ জাগে।

আর একজন বলল, আমরা যদি কাউকে হত্যা বা কারো শ্লীলতা-হানি করতে উদ্যত হই, ঈশ্বর কি তাকে রক্ষা করতে পারে? কথাটা বলেই অস্বাভাবিক তপ্ত দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকাল। সেই সময় চারজন লোককেই—আমার অতি ভয়ঙ্কর মনে হ'ল। ক্রমশ একটু

একটু করে তাদের চরিত্রের মধ্যে এক একটা শয়তানের ক্ষুধিত আত্মা যেন বেরিয়ে আসতে লাগল। ওঃ, কি অদ্ভুত শয়তানীতে ভরা ছিল লোকগুলোর অন্তর। আমি জন্মেশ্বরকে ডাকলাম। লোকগুলো বোধহয় আমার অভিপ্রায় বুঝতে পারল, তাই ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে আমার আতিথেয়তার গুণগান শুরু করে দিল।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল এই লোকগুলোর মধ্যে একজন কে আমি চিনি। মনের গোপন কন্দরে আঁতিপাতি করে ভাবতে লাগলাম কোথায় দেখেছি লোকটিকে। আর তখনই মনে হ'ল, এ তো সেই লোক যে আমার স্বামীর কাছে খোদাইকারের কাজ করত।

খুব কৌতূহল নিয়ে শুনছিলাম যুবতীর কথা। হঠাৎ স্বামীর কথা বলতেই বললাম, আপনার স্বামী···

"ওঃ, আপনাদের বলাই হয় নি। আমার স্বামীর পাথরের ব্যবসা। পাথরের উপর বিভিন্ন মূর্ত্তি খোদাইকরাদের দিয়ে, খোদাই করিয়ে দেশ বিদেশে চালান দিতেন। তাঁর পরিকল্পনা মাফিক মূর্ত্তি খোদাই করত কারিগররা, এবং কাজগুলি তারা নিজের নিজের বাড়িতে বসেই করত। কাজ শেষ হয়ে গেলে মাল জমা দিয়ে টাকা নিয়ে যেত তারা।

বললাম যে লোকটিকে আপনার চেনা বলে মনে হল, সে কি সত্যি খোদাইকার ছিল?

হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, এই মুহূর্তে আমার মনের দর্পণে তার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হচ্ছে। আপনারা কি তার মুখ দেখতে চান?

আমরা ঘাড়নেড়ে সম্মতি জানালাম।

সে বলল, তা হলে শিলিংয়ের বুকে ঝুলন্ত ওই মাকড়সার জালের দিকে তাকিয়ে থাকুন।

আমরা দুজনে কৌতূহল বশত বিস্ময়কর ভাবে মাকড়সার জালের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে রহস্যের গভীর অন্তর থেকে মাকড়সার জালের মাঝখানে ভেসে উঠল একটি মুখ। সে মুখ দেখে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। লক্ষ্য করলাম লোকটির

মাথাটা অস্বাভাবিক বড়, স্ফীত কপাল ভেতরে বসে গেছে, থ্যাবড়ান নাকের দুপাশে থেকে দুটো হলদে চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। কয়েক সেকেণ্ড স্থিরভাবে থেকে মুখটি আবার আঁধারে মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে যাবার মুহূর্তে তার ঠোঁটে লম্বা সরু সেলাইয়ের দাগের মত একটা হাসিররেখা ফুটে উঠেছিল।

কোথা থেকে যেন একটা গোঁ-গোঁ শব্দ ভেসে এল। জয়ন্তী কান খাড়া করে শব্দটা শোনার চেষ্টা করতে লাগল। শব্দটা এত বিশ্রি লাগছিল যে মনে হচ্ছিল একটা মোষের কণ্ঠনালীকে কে যেন ছেদন করছে। জয়ন্তা অধের্যভাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু যুবতী ইংগিতে তাকে চুপ করে থাকতে বলল এবং উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে লম্বা লম্বা পা ফেলে করিডোরের দিকে চলে গেল। আমি ব্যাপারটা বোঝার জন্য তাকে অনুস্মরণ করে কয়েক পা যেতেই তীব্র বেগে ঘুরে দাঁড়াল যুবতী এবং আঙুলি উঁচিয়ে হুঁশিয়ারের ভংগীতে কঠোরভাবে বলল, টেবিল ছেড়ে উঠে আসবেন না।

যুবতী বেরিয়ে যেতেই দরজার পাল্লা দুটো ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। সে শব্দে ডিনার টেবিলের গ্লাস, প্লেটগুলো পর্য্যন্ত নড়ে উঠলো।

আমরা রুদ্ধ কক্ষে পাথরের মূর্ত্তির মত বসে আছি। আমাদের নিঃশ্বাসের গতি প্রকৃতি যদিও খুব দ্রুত ওঠানামা করছে, তবু নিজেদের প্রাণহীন বলেই মনে হচ্ছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই যন্ত্রণাকাতর আর্তরবের গোঙানি স্তব্ধ হয়ে গেল। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জয়ন্তীর কাঁধে হাত রাখলাম। সে তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে আমার ঘাড়ে মুখ রেখে কঁকিয়ে কেঁদে উঠল এবং আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, চল। এখান থেকে পালিয়ে যাই।

ওর কথা শেষ হতেই ঝনাৎ করে শেকলের শব্দ হল। দরজার

পাল্লা খুলে গেল। এসে দাঁড়াল যুবতী। আমরা গভীর আগ্রহের সাথে তার হাবভাব লক্ষ্য করলাম।

সে বলল, আমি জানতাম আমার স্বামী একাই শয়তানটাকে শায়েস্তা করতে পারবে তবু মনে একটা সংশয় ছিল।

কথা বলতে বলতেই কপালে হাত রেখে ঘাম মুছছিল সে। তার ভাব ভঙ্গি দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম স্বামীর জন্য যতটা না উৎকণ্ঠা তার থেকে বেশি উৎকণ্ঠা নিজের জন্য।

হঠাৎ প্রাসাদের অন্য কক্ষ থেকে কর্কশ স্বরে কে যেন বলল, মানুষকে বিশ্বাস কর না।

সেই অদৃশ্য পুরুষের কণ্ঠস্বরে আকুতিতে আর মিনতিতে ভরা ছিল। শুধু তাই নয় অজ্ঞাত কোন আতংক যেন তার দেহ মনকে ভরাক্রান্ত করে রেখেছে।

জয়ন্তী এবং আমি দুজনেই সম্মোহিতের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি যুবতীর দিকে। কানে এল পাষাণ চাপা নিস্তব্ধতার বুকে খস্ খস্ আওয়াজ। কে যেন ডাইনিং হলের মেঝেতে খালি পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে অথচ তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

এরই মধ্যে লক্ষ্য করলাম যুবতী একটা চুলের কাঁটা নিয়ে খেলা করতে করতে নিজের আঙুলে বিদ্ধ করল। মুহূর্তে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল আঙুল থেকে। আমি হতচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। নিদারুণ ভীতি মেশান স্বরে বললাম, ম্যাডাম, এ আপনি কি করেছেন?

কোন উত্তর দিল না যুবতী। শুধু অস্ফুট হাসির রেখা টেনে, স্থির হয়ে বসতে অনুরোধ করল আমাকে। এ ভাবে কয়েক মিনিট কেটে যাবার পর পরিবেশটা আবার স্বাভাবিক হ'ল।

যাক। ভয়ংকর একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেলেন। কথাটা বলেই আমাদের দিকে তাকাল যুবতী।

বিপদ?

হ্যাঁ। আমার স্বামী রক্তপানের জন্য ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। এ ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা আমি আগেই জানতাম। তাই আপনারা

প্রাসাদে প্রবেশ করার সাথে সাথেই তাকে আত্মা কক্ষে আবদ্ধ করে রেখে এসে ছিলাম। কিন্তু আমার নির্বোধ পাচকটি স্বামীর কথায় আত্মা কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। সে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে এবং যে শয়তানটির মুখ আপনারা কিছুক্ষণ আগে মাকড়সার জালের মধ্যে দেখে ছিলেন তাকে দেখতে পায়। পরক্ষণেই উল্কাবেগে শয়তানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড হাতাহাতি আরম্ভ হয়। আর্তস্বর শুনে ছুটে গিয়ে দেখলাম লোহার মত শক্ত হাতের দশটা আঙুল দিয়ে অক্টোপাসের মত শয়তানের গলায় চাপ দিচ্ছে আমার স্বামী। ঘটনার বেগ যাতে না বাড়ে সে কথা মনে করেই স্বামীকে সরিয়ে দিলাম। কিন্তু সে এত জেদী এবং এক গুঁয়ে যে কিছুতেই তাকে আর আত্মা কক্ষে নিয়ে যেতে পারলাম না।

মুখে তার শুধু এক কথা, রক্ত দাও চলে যাব। দুটো তাজা রক্ত এখন তোমার আশ্রিত। কেন তাদের রক্ত পাব না? বাধ্য হয়েই নিজের রক্ত কিছুটা দিলাম। এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। যাক এখন সে আত্মা কক্ষে চলে গেছে। আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ। যুবতীর কথা শুনতে শুনতে রক্তে হিম ধরে যাচ্ছিল আমার। নিজেই নিজের দেহে চিমটি কেটে বোঝার চেষ্টা করলাম, সত্যি আমি জীবিত না মৃত।

হঠাৎ জয়ন্তী বলল, সেই লোকগুলি সম্পর্কে আমরা কিন্তু কিছুই জানতে পারলাম না। কাহিনীর শেষ পরিণতি কি হ'ল?

আপনাদের দেখে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আজ বিশ্রাম করুন বাকিটা কাল শুনবেন।

বললাম, দুর্যোগের রাত পোহালেই তো চলে যাব। তা ছাড়া আপনি হয়তো জানেন কাহিনীর সৌরভ যেখানে লেখক ও সেখানে।

তা হলে আসুন আমরা আর এক পেগ করে হুইস্কি পান করি। কথা শেষ করেই হাত তালি দিয়ে জগেশ্বরকে ডাকল যুবতী। তার ইংগিতেই পাত্র পূর্ণ হল। হুইস্কি পান করতে করতে আবার কাহিনী

শুরু করল যুবতী।

...লোকগুলি আহার শেষ করে শুভ রাত্রি জানিয়ে উঠে দাঁড়াল। যাবার মুখে সেই খোদাইকার লোকটি ফিস্ ফিস্ করে অন্য একজনকে বলল, মহিলা আমাকে চিনতে পেরেছে! এখন উপায়?

তার কথা শুনেও না শোনার ভান করলাম। এবং খুব দ্রুত টেবিলের অন্য পাশে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনাদের নাম এবং পরিচয় জানতে পারলে খুব খুশি হ'ব।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমার নাম বটুকেশ্বর সরকার প্রথম জন কথাটা বললে।

আর ইনি? দ্বিতীয়জনকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম।

সে বলল, আমার নাম গিরিধারী গোসাং। আটগড়ের বাসিন্দা।

তৃতীয়জনকে বোঝাই যাচ্ছিল অন্য অঞ্চলের লোক। তাকে কিছু বলার আগেই সে বলল, আমার নাম ভূতরাজ ঘিসিং।

চতুর্থজনকে বলার কিছু ছিল না। নাম না জানলেও চিনি। তবু সে নেকড়ের মত দু পাটি দাঁত বার করে বলল, আমার নাম ভিখন। কষাই ভিখন। পুরীর লোক আমি।

ধন্যবাদ। আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।

আলো আঁধারী করিডোর পার হয়ে ওরা অতিথি কক্ষে প্রবেশ করল। আমি স্বামীর জন্য একটা উদ্বেগ নিয়ে বসে আছি। কারণ ভুবনেশ্বর থেকে সন্ধ্যার আগেই তার ফেরার কথা ছিল। তা ছাড়া লোকগুলির হাবভাব লক্ষ্য করেও মনে একটা বিপদের আশংকা জেগেছিল, কাজেই রাতটা জেগে কাটানই শ্রেয়। জন্মেশ্বরকে শুতে বলে আলমারি থেকে একটা বই বার করে আরাম কেদারায় দেহ এলিয়ে পড়তে শুরু করলাম। বইটা ছিল একজন বিখ্যাত লেখকের লেখা ভৌতিক কাহিনী। 'মরণ পারের গোপন কথা।'

কাহিনীটা যখন পরম তৃপ্তির সাথে উপভোগ করছি, ঠিক সেই সময়েই কুকুরটা তীব্র স্বরে চিৎকার করে উঠল এবং পাগলের মত সারা বাগানটা ছুটোছুটি করতে লাগল।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটায় আমি খুব একটা গুরুত্ব দিই নি কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে যখন সারা প্রাসাদে শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এল এবং কুকুরটার অস্তিত্ব আছে কি নেই বোঝা গেল না, তখন বই রেখে হলঘর অতিক্রম করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। আর সেই মুহূর্তেই অতিথিদের কণ্ঠ থেকে এমন একটা কথা শুনতে পেলাম যা তরল এসিডের থেকেও ভয়ংকর। কানের ভেতর দিয়ে সত্যি যেন খানিকটা এসিড কলিজায় প্রবেশ করল। অব্যক্ত যন্ত্রণায় প্রাণ ছটফট করতে লাগল। তবু শেষ কথাটি শোনার জন্য দাঁড়িয়ে রইলাম।

খুব সম্ভব মিঃ সরকারই বলে ছিল, মাত্র পনের হাজার টাকার জন্য যাকে খুন করেছিস সে তা হলে এই ভদ্রমহিলার স্বামী ?

ওর কথা শেষ হতেই ভিখনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

আমি জাতে কষাই ছিলাম। এর আগেও খুন জখম লুটপাট করেছি। পুলিশ পেলে আমাকে গুলি করে মারবে। একটা বছর জংগলেই লুকিয়ে ছিলাম। জংগলেই একদিন সাক্ষাত হয়ে ছিল ভদ্রমহিলার স্বামীর সাথে। সেই আমাকে খোদাইয়ের কাজে নিয়োগ করেছিল। ভালই ছিলাম কিন্তু হঠাৎ একদিন কষাইয়ের প্রবৃত্তিটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। মহিলাটিকে শয্যা সঙ্গিনী হিসাবে পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলাম কিন্তু নেকড়ের মত কুকুরটাই সেদিন আমার সাথে শত্রুতা করেছিল।

আমি জানতাম মহিলাকে পেতে হলে আমাকে ছুটি প্রাণীকে হত্যা করতে হবে। এক মহিলার স্বামী, ছুই হিংস্র কুকুরটি। আজ সে কাজে সফল হয়েছি। জংগলে একা পেয়ে যখন ভদ্রমহিলার স্বামীকে খুন করলাম তখন ভাবি নি যে আজ রাতেই কুকুরটিকে মেরে ফেলতে পারব। কাজ শেষ। এখন আমি মহিলাটির ঘরে যাব।

ওর কথা শুনে ভূতরাজ তাচ্ছিলের হাসি হাসল। এবং খুব সম্ভব কুকরীর ধার পরখ করতে করতে বলল, অসহ্য। না, মহিলার ইজ্জতে

হাত দেওয়া কিছুতেই সহ্য করব না।

ভূতরাজের কথায় সায় দিল গোমাং। আর সরকার বলল, আমরা সকলেই নানান দোষে দোষী। চুরি ডাকাতি করছি নিজেদের পেট চালাবার জন্য। কিন্তু দলের কেউ যদি নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে তাকে দল থেকে বাদ দেওয়াই উচিত।

'ওদের কথা শুনে মুখ খিস্তি করে হেসে উঠল ভিখন কষাই। বলল, তোরা মূর্খল্যাও তৈরী করে কোন দিন যদি নেতাও হয়ে যাস তবু লোকে ঘৃণা করবেই। কাজেই যা ইচ্ছে তাই করব।
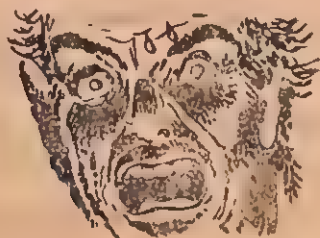
আস্তে আস্তে তর্ক যুদ্ধটা খুব দ্রুত শারীরিক যুদ্ধের রূপ নিতে লাগল। শুরু হ'ল ঘুঁষো ঘুঁষি, ধাক্কা ধাক্কি। কে যে কাকে মারছে বোঝা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড একটা উত্তেজনা আর বোবা কান্না বুকে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে ছুটে যাচ্ছি হঠাৎ মনে হ'ল বারান্দা দিয়ে যেন খ্যাপা কুকুরের মত কে যেন ছুটে আসছে। ফিরে তাকালাম ঠিক সেই মুহূর্তেই বীভৎস হাসি হেসে কষাইয়ের ছোরাটা আমার বুকে আমূল বিদ্ধ করে দিল। তারপর কলিজার ভেতর থেকে রক্তমাখা ছোরাটা টেনে নিয়ে বাগানের পথে ছুটতে লাগল ভিখন।

মেঝেতে পড়ে আমার রক্তাক্ত দেহটা তখন ও কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঘুমন্ত আত্মাটা ঘূর্ণি ঝড়ের মতই দেহের চারপাশে চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আত্মাটি যখন তার প্রিয় খাঁচাটি পরিত্যাগ করে যেতে চাইছে না ঠিক তখনই বর্শা বিদ্ধ শূকরের চিৎকারের মত কর্কশ চিৎকার ভেসে এল। বেশ বুঝলাম ভিখনকে ওর বন্ধুরা হত্যা করছে।

খুব দ্রুত কাজটি শেষ করে তিনজনে ভিখনের দেহটা টানতে টানতে ওই খরস্রোতা নদীর জলে ফেলে দিল। তার পর তিনজনে আগাছার ভেতর দিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে খুব নিচুস্বরে নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করল। খুব সম্ভব আমার ধনরত্ন সম্বন্ধেই কথা বলছিল ওরা।

এরই মধ্যে আমার প্রাণহীন দেহের কথাটা উঠল। একজন বলল, মহিলাকে গর্ত খড়ে পুঁতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর একজন বলল, নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়াই ভাল। তৃতীয়জন বলল, আমরা ওর ধনরত্ন না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই করব না।

শেষ পর্যন্ত তার কথাই সকলে মেনে নিল এবং অস্পষ্ট অন্ধকারে উঠোনের সিমানা পার হয়ে তরতরিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে এল তারা।

ভূতরাজ ঝুঁকে পড়ে আমার মুখ চোখ নাক কান হাতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেহের সমস্ত অলংকার গুলি টেনে টেনে ছিঁড়ে নিতে লাগল। তারপর তারা আমার সিন্দুকের চাবিটি তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল।

কিন্তু অনেক খোঁজা খুঁজির পরও যখন চাবির হদিস করতে পারল না, তখন পাথর খোদাই করা ছেনি হাতুড়ি দিয়ে সিন্দুকের চাবি ভেংগে ফেলল।

পরক্ষণেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল তারা। তারপর তিলে তিলে সঞ্চিত ধনরত্ন টাকাকড়ি থলির মধ্যে ভর্তি করে আমার দেহটাকে তালগোল পাকিয়ে চোরাকুঠরীর মধ্যে নিক্ষেপ করে তালা বন্ধ করে চলে গেল।

সেই নিষ্ঠুর মানুষগুলির সমস্ত গতিবিধি জম্বেশ্বর দেখেছিল। কিন্তু কিছুই তার করার ছিল না। কারণ তাদের তিনজনের হাতেই ছিল ধারাল অস্ত্র। সে অস্ত্র মুহূর্তে তার প্রাণ কেড়ে নিতে পারে।

লোকগুলি জঙ্গলের পথেই ছুটে যাচ্ছে।

আমার আত্মাও তাদের পিছনে পিছনে ছুটছে।

লোকগুলি যখন বেশ কিছুটা দূরে চলে গেছে। তখন জন্মেশ্বর মনে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে আমার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করল এবং পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দেহটা কিছুটা উঁচু করে দেওয়ালে ঝোলান তরবারিটা নামিয়ে আনল। তারপর সজাগ সতর্কভাবে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে লোকগুলিকে অনুসরণ করল। প্রভু-পত্নীর হত্যার প্রতিশোধ নিতে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

অরণ্যবেষ্টিত ছোট পাহাড়টার কাছে এসে একটা পাথরের চাঁই সরাল লোকগুলি। তারপর টর্চের আলোয় হামাগুড়ি দিয়ে গুহায় প্রবেশ করল তারা।

জন্মেশ্বর ভাবল গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়ে খুব সহজভাবেই লোক-গুলিকে হত্যা করতে পারব। কথাটা মনে হতেই খুব তৎপরতার সাথে সে গুহার মুখ বন্ধ করে বসে থাকল। লোকগুলি নিস্তব্ধ গুহার মধ্যে হঠাৎ মৃদু শব্দ শুনে বিপদের গন্ধ পেল। তারা বেশ বুঝতে পারল কেউ তাদের অনুসরণ করে গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, কাজেই অতর্কিতে তাকে আক্রমন করতে হবে।

জন্মেশ্বরের জানা ছিল না যে গুহা থেকে বাইরে আসার আর একটি পথ আছে।

লোকগুলি সেই পথ দিয়ে নিঃশব্দে বাইরে এল এবং পিছন থেকে জাপটে ধরল তাকে।

তারপর অকস্মাৎ কুকরীর একটা কোপ পড়ল তার ঘাড়ে। মুহূর্তে মৃত্যুর বিষাক্ত ছোঁয়া স্পর্শ করল জন্মেশ্বরকে, তাকে টকরো টুকরো করে গুহার মধ্যে ফেলে দিল তারা।

অর্থের সিঁড়িতে পা রেখে আবার সভ্যসমাজে মিশে গেল সেই লোকগুলি।

কয়েক বছরের মধ্যেই মান্যগণ্য ব্যক্তিতে পরিণত হ'ল তারা।

কিন্তু জঘন্য অপরাধ করেও প্রমাণের অভাবে পার পেয়ে গেল। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উঁচুদরের মানুষের মুখোস পরে বহাল তবিয়তে তারা শহরে বাস করেছ। এই সমস্ত ক্রিমিন্যালদের শাস্তি হওয়া উচিত নয় কি?

যুবতীর মুখ থেকে কাহিনীটা শুনতে শুনতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ঘটনাগুলো অবিশ্বাস্য বলেই মনে হচ্ছিল। তাই বললাম, সেই লোকগুলি এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে তার হদিশ কি দিতে পারেন?

হ্যাঁ। আমার বিক্ষুব্ধ আত্মা প্রতি মুহূর্তে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

কিন্তু সেই লোকগুলিই যে অপরাধী বা হত্যাকারী তার প্রমাণ কি?

তা হলে আসুন আমার সাথে। আমি আপনাদের প্রমাণের নিদর্শণ স্বরূপ এমন কতকগুলি জিনিস দেখিয়ে দেব যা আইনজ্ঞ বা পুলিশের হাতে তুলে দিলে অপরাধীরা শাস্তি পাবেই। কিন্তু আগে আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন এই হত্যাকাণ্ডের কেসটি কোন আইনজ্ঞকে দিয়ে উত্থাপন করাবেন?

প্রতিজ্ঞা করা সম্ভব নয়। তবে চেষ্টা করব। আমার কথায় যুবতী নড়ে চড়ে বসল। আর তখনই আমার মনে হ'ল শরীরটা যেন হালকা হয়ে যাচ্ছে। জয়ন্তীর দিকে তাকাতেই দেখলাম সে বিনুনীটা খুলে আপন মনেই একরাশ চুলের ভেতরে এলোমেলো ভাবে আঙুল চালিয়ে খেলা করছে। কোমল বাহুদুটির উত্তোলনে বক্ষের বস্ত্র সরে গেছে। ধূসর রূপোলী একটা ছায়া এসে পড়েছে আঁটোসাঁটো বুকের মাঝে। আর তার সেই বুকের দিকে টর্চের আলোর মত জম্বেশ্বরের এক জোড়া চোখ তীব্রভাবে আঘাত করছে।

জম্বেশ্বর গল্পের মাঝে কখন যে ঘরে ঢুকে এক কোণায় ঘাপটি মেরে বসেছে বুঝতে পারি নি।

জম্বেশ্বরের কুৎসিত দৃষ্টিটা ভাল লাগল না। বেশ বিরক্ত ভাবে

ওর দিকে তাকালাম। ও বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝতে পারল। একটা গা ঝাড়া দিয়ে বিকট ভাবে হাই তুলে মুখের কাছে তিনবার তুড়ি মারল।

যুবতী বলল, আপনি সৎ এবং মানীলোক। আপনি একটু চেষ্টা করলে নরঘাতকগুলি শাস্তি পেতে পারে। আমাদের বিক্ষুব্ধ আত্মার শান্তির জন্য এটুকু কি করতে পারেন না ?

বললাম, আপনাদের মৃত্যুর পর পুলিশ নিশ্চয়ই অপরাধীদের ধরার চেষ্টা করে ছিল ?

সে চেষ্টার মধ্যে কোন আন্তরিকতা ছিল না। দু চারদিন হৈচৈ হয়ে ছিল, তারপর সব চাপা পড়ে গেছে। লোকবল, অর্থবল না থাকলে কোন দিন কোন কেসের সুরাহা হয় না। তা ছাড়া এসব কেসে সাক্ষীই তো আসল।

আপনাদের হত্যাকাণ্ডের তো কোন সাক্ষী নেই।

সাক্ষী রেখে কি কেউ কাউকে হত্যা করে ?

তবু তো এমন কিছু একটা সূত্র থাকবে, যে সূত্র ধরে প্রমাণ করা যাবে অপরাধী কারা ?

সেই সূত্র এবং প্রমাণ স্বরূপ এমন কিছু জিনিস আপনাকে দেখাব যা কোর্টে উপস্থাপিত করতে পারলে তারা শাস্তি পাবেই। চলুন আমার সাথে।

যুবতী উঠে দাঁড়াল। আমরা তাকে অনুসরণ করলাম। অস্পষ্ট অন্ধকারে প্রাসাদের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াতেই গা ছমছম করে উঠল। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একটা কালো রংয়ের কুকুর ছুরির ফলার মত লকলকে জিভ বার করে শূন্যে ভাসতে ভাসতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

লাল চাদরে কুকুরের পিঠটা ঢাকা ছিল। শূন্যে ভাসতে ভাসতেই যুবতীর হাঁটুতে চুমু খেল কুকুরটি।

যুবতী কুকুরের পিঠ থেকে লাল চাদরটি তুলে নিতেই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল জন্তুটি।

যুবতী লাল চাদরটি ভাঁজ করে জয়ন্তীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল,,

এটি গোমাং নামক দস্যুর চাদর। খুর্দা রোডের তাঁতির তৈরি। একবার মাত্র গঞ্জামের একটি লণ্ড্রিতে কাচিয়ে ছিল। চাদরের কোণায় তেলেগু ভাষায় সে নাম্বার লেখা আছে ওই নাম্বারের ক্যাশ মেমোতে গোমাংয়ের নাম ঠিকানা পাবেন।

হাঁটতে হাঁটতে প্রাসাদটাকে পিছনে রেখে একটা জংগলের ভেতর এসে পড়লাম। একটা জীর্ণ নড়বড়ে কাঠের ব্রীজ পার হতেই বাতাসের স্তর ভেদ করে একটা দুর্গন্ধ আমাকে অস্থির করে তুলল। সেই মুহূর্তে মনে হল আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব।

যুবতী বলল, অস্থির হবেন না। একটু ধৈর্য ধরুন। ব্রীজের দক্ষিণ দিকে যে খাদটা দেখছেন দস্যুগুলি আমার স্বামীকে খুন করে ওই খাদে ফেলে দিয়ে ছিল। রক্তমাখা হাঁসুয়াটি সঙ্গে রাখা নিরাপদ নয় ভেবে ছুঁড়ে ফেল দিতেই মাটিতে না পড়ে পাকুড় গাছে বিদ্ধ হয়ে আটকে গেছল। ওটি পরীক্ষা করলেই রক্তের দাগ এবং হাতের ছাপ পাবেন।

বললাম খাদের নিচে পাকুড় গাছ থেকে হাসুয়া সংগ্রহ করা কি সম্ভব? তা ছাড়া এতদিন পর ছাপ বা রক্তের দাগ নিশ্চয়ই মুছে গেছে।

কথাটা শেষ হতে না হতেই চোখের সামনে একটি অচেনা মানুষের শরীর ভেসে উঠল। মানুষটি বেশ লম্বা। শরীরের চামড়া কোঁচকানো, জ্বলজ্বলে চোখ। লোকটি ভাঙা ভাঙা স্বরে ভয়ার্ত এক আবেদন জানাল।

শিগ্‌গির এখান থেকে চলে যান। তা না হলে চিরজীবনের মত এই পাকুড় গাছেই আটকে যাবেন।

লোকটির কথা শুনে যুবতীর দিকে তাকালাম কিন্তু তাকে দেখতে পেলাম না। জয়ন্তীও নেই। এ অবস্থায় আমি যখন নিরাপদ আশ্রয়ের কথা ভাবছি, ঠিক সেই মুহূর্তেই অকস্মাৎ আমার সতর্ক চেতনার স্বত্বা কেড়ে নিয়ে কে যেন একটি ভারি জিনিস দিয়ে আঘাত করল আমাকে।

আর্তস্বরে দূরে সরে গেলাম আমি। ঠিক তখনই কোথা থেকে যেন যুবতী আর জয়ন্তী এসে দাঁড়াল।

যুবতী বলল, ওই হাঁসুয়াটি রুমাল চাপা দিয়ে তুলে নিন। দেরি করবেন না।

উদ্বেগ আর ভয়ের সাথে যখন হাঁসুয়াটি উঠিয়ে নিলাম, জয়ন্তী তখন এক রকম জোর করেই আমাকে হেঁচ্‌কা টানে হাত দশেক টেনে·নিয়ে ঢুকে গেল একটি গুহায়।

পুঞ্জীভূত অন্ধকারের গর্তে প্রবেশ করতেই বুঝতে পারলাম দস্যুগুলি এখানেই নিরাপদে দীর্ঘ দিন কাটিয়েছিল। তাদের ব্যবহৃত কিছু জিনিস এবং একটি ডাইরী পেলাম। এই নরকের পাতালে থেকে লোকগুলি যে দিনের পর দিন কুৎসিত জঘন্য কাজ করে গেছে তার অজস্র প্রমাণ রয়ে গেছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমরা যখন গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম তখনই একটা অদৃশ্য কণ্ঠস্বর গমগমিয়ে উঠল। মনে হ'ল সেই অদৃশ্য স্বরটি যেন সতর্ক করে দিয়ে বলছে ঃ আমার নির্দেশ অমান্য করলে আপনার পরিণাম ও আমার মতই হবে। যে নারীর সাথে এখানে এসেছেন তাকে আমি ঘৃণা করি। জীবনে যদি কোন ভয়ংকর বীভৎস মানুষ দেখে না থাকেন তা হলে ওকে ভাল করে দেখুন। আপনি কি কোন দিন শুনেছেন, স্বামী হত্যাকারীদের সাথে স্ত্রী এক টেবিলে খানাপিনা করে? এখন ও বলছি পালান। তা না

হলে খুব শিগগিরই ওর শিকারে পরিণত হবেন।

গভীর রাতে গহন বনে অদৃশ্য আত্মার সতর্ক সংকেত শোনার পর ভয়ে জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল আমি যেন একটা মমীর সাথে চলা ফেরা করছি। হ্যাঁ, সত্যি বলছি জয়ন্তীকে দেখে মৃত বলেই মনে হচ্ছিল।

যুবতীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, খুব শান্তভাবে আমার বাঁদিকে সরে আসুন। এবার ওই পথটা ধরে প্রাসাদের চলে যান। আমার সাথে আর দেখা হবে না। কাজেই আমাদের হত্যাকারীদের যাতে শাস্তি হয় সে বিষয়ে একটু দেখবেন। বেশ উচ্চকিত স্বরে কথাটা বলল সে।

আমি বললাম, আমার কিছু জানার ছিল।

বলুন ?

আপনাদের এ ভাবে মৃত্যু হ'ল কেন ? শুনেছি, বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চক প্রতারকদেরই এভাবে মৃত্যু হয় ?

হ্যাঁ, আপনার অনুমান সত্য। কিছু কিছু জঘন্য কাজ আমরাও করে ছিলাম। এবং সত্যিকথা বলতে কি সে গুলো ছিল জৈবিক প্রবৃত্তির ফসল। কামনার জ্বালাধরা যৌবনে ইন্দ্রিয় সুখটাই বড় হয়ে উঠেছিল।

কামনা বাসনা তো যৌবনের ধর্ম। তার মধ্যে পাপ কোথায় ? তা ছাড়া আপনি আপনার স্বামী এবং পাচক এই তিনজন একই পাপে পাপী হলেন কি করে ?

তিনজনকে একই পাপে পাপী বলছেন কি কারণে ?

তিনজনের মৃত্যু একই ভাবে হয়েছে বলে। অন্যভাবেও তো কারো মৃত্যু হতে পারত ?

এর উত্তর পরে পাবেন। আর এক মুহূর্ত দেহধারণ করে থাকতে পারব না। আপনার চলে যান। যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে যান। এতক্ষণ আমি আপনাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে

এসেছি কিন্তু আমি চলে গেলেই অন্য কোন বিক্ষুব্ধ আত্মা ক্ষতি করতে পারে।

কথাটা শেষ হওয়া মাত্র প্রচণ্ড ধুলি ঝড়ে আকাশটা ভরে গেল, তারই মাঝে ঝড়ের বুকে পা রেখে শোঁ-শোঁ শব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল যুবতী।

এই রহস্যময় ব্যাপারটায় আমি কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ পর ভাঙা ভাঙা স্বরে জয়ন্তী বলল, দেখ আকাশের কোণে কেমন একটা লালবিন্দু দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় রাত শেষ হয়ে আসছে।

কথাটা বলেই একটা অসাড় হাত দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরল সে। চলতে চলতে দুলতে লাগল। ঠিক যেন মাতালের পায়ের ছন্দ।

আধঘণ্টার মধ্যেই প্রাসাদের সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালাম। ঠিক সন্ধের সময় জল ঝড়ে যে ভাবে ঢুকেছিলাম, তেমনি ভাবে ঢুকলাম। তখনও বুঝতে পারিনি যে ভয়াল চমকে ভরা নিদারুণ এক বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

খোলা দরজার চৌকাঠ পার হতেই রক্তাক্ত দুটো হিংস্র চোখ আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল। প্রায় অন্ধের মতই আমি সেই চোখের আকর্ষণে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই বিদ্যু-দ্বেগে কে যেন আমাকে আত্মা কক্ষে টেনে নিয়ে গেল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি জয়ন্তী আমার আগে আগে ছুটে যাচ্ছে। তাকে ধরার জন্য তীব্রবেগে লাফিয়ে পড়লাম, মুহূর্তে একটা উল্লাসের অট্টহাস্যে সারা বাড়িটা কেঁপে উঠল। আর সে হাসিটা লেলিহান অগ্নিশিখার মতই আমাকে দগ্ধ করতে লাগল। চিৎকার করে বললাম, জয়ন্তী···। তুমি কোথায়?

বহু দূরে নরকের অন্ধকার ভেদ করে অস্পষ্ট একটি স্বর ভেসে এল। আমাকে বাঁচাও।

তুমি কোথায়? আমি থাকতে কোন শয়তান তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।

জানি। আর সেই জন্যই তো সুদূর পুরী থেকে তোমার হাত ধরে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু···

কথাটা শেষ হবার আগেই জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। আমি প্রচণ্ড ক্রোধে রিভলবারের গর্জনের মত শব্দ করে অন্ধকারে প্রতিহিংসার উন্মত্ততায় সারা ঘরময় ছুটোছুটি করতে লাগলাম।

হঠাৎ এক ঝলক তীব্র আলো আমার চোখ ছুটো যেন ঝলসে দিল। নরকের অন্ধকারে আলো দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এবং ক্ষণকালের মধ্যেই বুঝতে পারলাম ওটা আলো নয় ছুটো জ্বলন্ত চোখে। আস্তে আস্তে জ্বলন্ত চোখ ছুটো আরো কাছে এগিয়ে এল। আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল দৃশ্যটা। তখনই বুঝলাম আমি একটা জীবন্ত কংকালের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তাকে দেখে আমার হাত পাগুলো ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগাল। রক্তে হিম ধরে গেল আমার।

মুহূর্তে সমস্ত নীরবতা ভংগ করে অগ্নিদগ্ধ হাতীর মত বিকট ভাবে ছুপাটি দাঁত বার করে জীবন্ত কংকাল বলল, নরকের অন্ধকারে আমিই টেনে এনেছি। কেন এনেছি জানেন?

কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, জানি না।

ওই যুবতী যে সমস্ত কথা বলেছে তা আমি জানি। এবং ওদের হত্যাকারীদের শাস্তি যোগ্য প্রমাণ ও এখন আপনার হাতে, কিন্তু আমি আমার বন্ধুদের পক্ষে।

আপনি কে?

আমি ভিখন্ কষাই। প্রাসাদ নন্দিনী পঞ্চমী পাণিগ্রাহীর কাছে আমার নাম শুনেছেন। আমিই তাকে হত্যা করেছি।

কেন আপনি তাকে হত্যা করেছিলেন? তা ছাড়া যে বন্ধু আপনাকে হত্যা করেছে তার প্রতিই বা আপনার এত সহানুভূতি কেন?

কেন আমি যুবতীকে হত্যা করেছিলাম পরে বলছি। আর বন্ধু ভূতেশ্বর ঘিষিং আমাকে হত্যা করলেও সে প্রতিদিন আমার জন্য চোখের জল ফেলে। আমাকে স্মরণ করেই সে একটি মূর্খল্যাণ্ড তৈরি করতে

চাইছে। যদি কোন দিন সে তা করতে পারে, সে দিন এই জীবন্ত কংকালই হবে তার প্রধান উপদেষ্টা।

কিন্তু আপনার বন্ধুরা সকলেই জঘন্য চরিত্রের লোক। তাদের বিচার হবেই। মৃত মহিলা যখন সমস্ত প্রমাণ হাতে তুলে দিয়েছে তখন প্রমাণগুলি আইনজীবির হাতে তুলে দেওয়া আমার কর্তব্য।

না। তা হতে পারে না। ওই মহিলার সম্বন্ধে কি জানেন আপনি ?

আমি কিছু জানতে চাই না। আমার কাজ আমি করব।

তার আগে আপনার প্রিয় সঙ্গিনীটিকে উদ্ধার করবেন না ?

কোথায় ? কোথায় জয়ন্তী ?

আমি তাকে আত্মা কক্ষে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।

কথাটা বলেই হো হো করে হেসে উঠল জীবন্ত কংকাল। আমি প্রচণ্ড ক্রোধে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মুহূর্তে সমস্ত ইন্দ্রিয় অসাড় হয়ে গেল।

অন্ধকারে ডুবে গেলাম আমি।

সারারাত আমার দেহটা প্রাসাদের উঠোনে পড়েছিল। কি ভাবে এখানে এসে ছিলাম জানি না। জ্ঞান ফিরতেই দেখলাম ভোরের নবারুণ রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে সারা উঠোনে। আর আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে জনাছয়েক জংলি মানুষ।
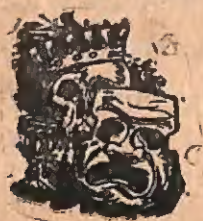
১৫ বি, অভয় সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০০১০

সব দেশেই ভূতের গল্প মানুষের কাছে ভয় এবং কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে মজার কথা যাঁরা ভূত বিশ্বাস করেন না তাঁরাও ভূতের গল্প পড়তে ভালবাসেন। তবে পাঠক যে ধরণের ভূতের গল্প পড়তে অভ্যস্থ এ কাহিনী তা থেকে সম্পূর্ণ সতন্ত্র।

জীবন্ত কংকাল এবং আত্মার কক্ষ কাহিনী দুটি যদিও নিছক কল্পনার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, তবু তার কিছু কিছু ঘটনা নিজের চোখে দেখা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতারই ফসল।

এ উপন্যাসে ঘটনাচক্রে অনেক চরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে, সবই কাল্পনিক চরিত্র। তবু যদি কারো চরিত্রের সাথে মিলে যায়, তাকে সম্পূর্ণ ভৌতিক ঘটনা বলেই ধরে নেবেন। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এটাই আমার একান্ত অনুরোধ।

বিনীত—
অগ্নীশ্বর

॥ জীবন্ত কংকাল দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে ॥